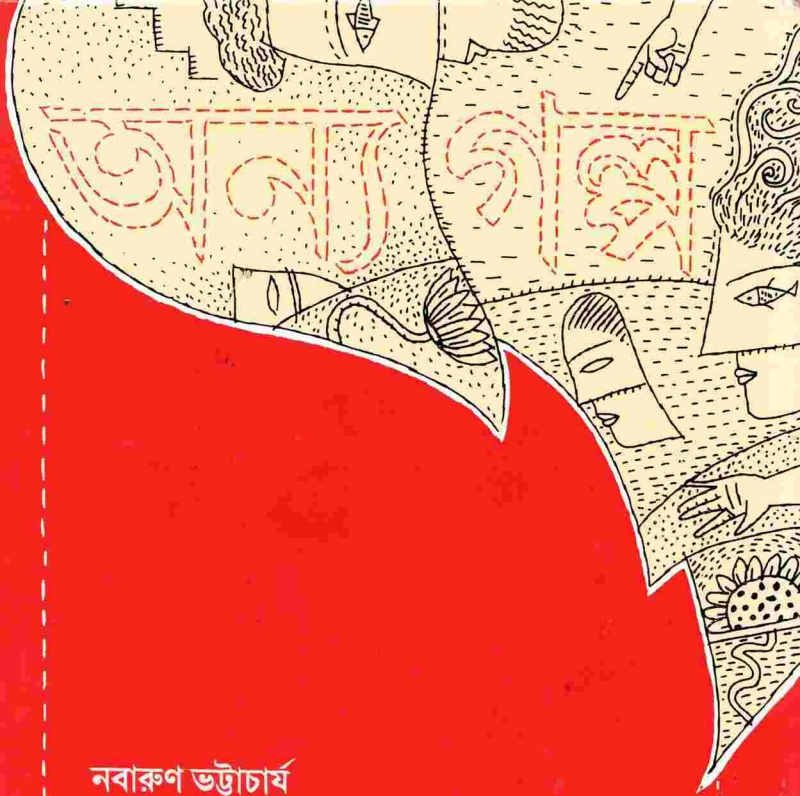

নবারুণ ভট্টাচার্য

পৃথিবীর শেষ কমিউনিস্ট

DESERTER

SCANNED BY

THE FALLEN ANGEL OF BOOKS

নবারুণ ভট্টাচার্য

পৃথিবীর শেষ কমিউনিস্ট

pathagar.net

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার বিভাগ
রাজারামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের
যৌথ প্রকল্প কর্তৃক উপহার

প্যাপিরাস ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

ADDITIONAL DISTRICT LIB... SILIGURI
ACC. No. 37112

PRITHIBIR SESH COMMUNIST
Collection of short stories by
Nabarun Bhattacharya
Published by Arijit Kumar
2 Ganendra Mitra Lane Kolkata 4

প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১০

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

ষাট টাকা

pathagar.net

প্যাপিরাস পক্ষে অরিজিৎ কুমার, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪ কর্তৃক প্রকাশিত ও টেকনোপ্রিন্ট,
৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন কলকাতা ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত

উৎসর্গ

গৌতম সেনগুপ্ত-কে

pathagar.net

চাকরির খাতিরে ঠাণ্ডা যুদ্ধের চাপা টেনশন আমার জীবনেও ছায়া ফেলেছিল। লালফৌজের দলে থাকার সুবাদে নানা রকম লোকের সঙ্গে মিশতে হয়েছে যাদের সকলেই ঝুঁকি নিতে ছিল তুখোড়, ফলে কিছুটা আঁচ আমার বরাদ্দেও জুটেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন আমার সেই নস্টালজিয়ার অসুখ যা আর সারবে না। এই এক-মেরু মুদ্রারাক্ষসের দুনিয়ায় আমি অচল। তার হদিস হয়তো পাঠকেরা গল্পগুলোর মধ্যে পাবেন।

২৮.১.১০

নবারুণ ভট্টাচার্য

pathagar.net

সূচি

৯/১১...	১১
গুপ্তঘাতক	১৬
চীন ২০০২	৩২
সাংহাইতে এক সন্ধ্যা	৩৬
৯৮৬৪৪	৪৪
নেকলেস	৫৪
টেররিস্ট	৬৯
পৃথিবীর শেষ কমিউনিস্ট	৭৬

pathagar.net

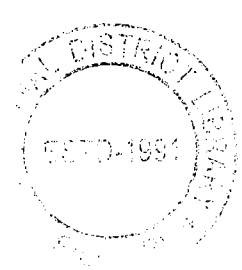

৯ / ১১...

"হ্যামলেট...? হাত আর পিঠে ব্যথাটা না থাকলে বরং কেমোথেরাপিতে কাজ হয়েছে কিনা নিয়ে কথা তোলা যেত। কিন্তু আমার আর কোনো ক্ষমতাই নেই—এটাই হচ্ছে সমস্যা" (আন্দ্রেই তারকোভস্কির ডায়েরির শেষ লেখা।)

১৫.১২.৮৬ পারি। ২৯.১২.৮৬তে মৃত্যু।)

১৯৮৬-র ডিসেম্বরের শেষে আমি মস্কো গিয়েছিলাম। পেরেসত্রোইকা। হোটেল রসিয়া থেকে বেরোচ্ছি, রাস্তার ধারে দেখেছিলাম ছোট্ট, লাল পোস্টার। তাতে ছোটো ছোটো অক্ষরে লেখা তারকোভস্কির ছবি দেখানো হচ্ছে। আমাকে নিতে এসেছিল ওলেগ তরচিনস্কি। ওলেগই বলেছিল তারকোভস্কি মারা গেছে। দিনটা ছিল ৩০ ডিসেম্বর।

২০০৪-এর জাপানেও তারকোভস্কি আর ওলেগ এসে গেল। যদিও অন্যভাবে। নারিতা এয়ারপোর্ট থেকে টোকিও গিয়েছিলাম লিমোসিন বাসে। যাবার রাস্তায় ঝিমুনি ধরেছিল। অসংখ্য গাড়ি চলেছে এদিক-ওদিক। কিন্তু একটাও হর্নের শব্দ নেই। হঠাৎ চটকাটা ভাঙতে দেখি বাসটা একটা সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে চলেছে। দুপাশে আলো। মনে পড়ে গেল এই সুড়ঙ্গ দিয়ে গাড়ি যাওয়ার ছবিটা ছিল 'সোলারিস'-এ। টোকিওতে ছিলাম একরাত্তির মাত্র। পরদিনই বুলেট ট্রেনে যেতে হয়েছিল আরও উত্তরের দিকে, মাঝারি শহর ইয়ামাগাতায়। যাদের সঙ্গে মিটিং ছিল তারা আমাকে রেখেছিল ইয়ামাগাতা গ্র্যান্ড হোটেলে। মিংটিয়ের পরদিনই আমার টোকিও ফেরার কথা। সেটাই ওলেগের জন্য ফেরা হয়নি। সন্ধেবেলায় ইয়ামাগাতা প্রিফ্যাকটরের অফিস থেকে হোটেলে ফিরছিলাম হেঁটে। রাস্তায় একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। ইচ্ছে ছিল একটা সান্তোরি হুইস্কি কিনব। জাপানিদের বানানো স্কচ্ কখনও খাইনি। যদিও মনে একটা ভয় ছিল। অজানাকে জানার এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চারে বেশ কয়েকবার পস্তাতে হয়েছে বলে। সান্তোরির অনেকগুলো বোতল সাজানো। কোনটা নেওয়া যায় ভাবছি, এমন সময় কাঁধে দুটো টোকা।

pathagar.net

— নিও না। অখাদ্য। শালারা ভেবেছিল স্কচের বাজার মেরে দেবে। উলটে নিজেরাই এখন আর টাচ্ করে না।

— ওলেগ!

— হ্যাঁ। ভূত নই।

— কিন্তু?

— জাপানিগুলো অবাক চোখে আমাদের দেখছে। চলো বেরোই।

— দাঁড়াও, মদ কিনব।

— আমি কিনেছি। তুমি চলো। ভাবা যায়?

— কী কিনেছ?

— ওফ্...স্কচ। টিচার্স। ইনফ্যাক্ট তোমাকে দেখার পরে।

আমরা টোকিওর থেকে অনেক বেশি ঠান্ডা ইয়ামাগাতায় বেড়িয়ে আসি। আমরা, হ্যাঁ, এই 'আমরা' শব্দটা গর্ব করে বলা গেল। আমরা পুরোনো, পোড় খাওয়া। এখনও প্রাক্তন 'বস' বা ভেরি স্পেশাল কেউ মারা গেলে, আমরা যখন মস্কোর কোনো কবরখানায় জড়ো হই, অবশ্য আমি নই, যেহেতু আমি কলকাতায় থাকি, তখন ফুটেজ তোলার জন্যে সি.এন.এন., বি. বি. সি.-র কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। আমরা কিছু বুঝি না। টিভির ক্যামেরার সামনে সানগ্লাস পরি। টুপি পরি। তবু ল্যাংলিতে, ইংল্যান্ডে এই ফুটেজ স্ক্যান করা হয়। ওরা খোঁজে। হিসেব রাখে। হিসেব মেলায়। পুতিন বা রাসপুতিনের রাশিয়া আমাদের চেনে না। বয়েই গেল। আমরা আমরা। আমাদের হিসেবগুলোও আলাদা। কিন্তু 'ইতিহাস থেমে যাওয়ার' পরেও বা 'শেষ হয়ে যাওয়ার' পরেও আমরা থেকে গেছি। যেমন ওলেগ থেকে গেছে। আমি থেকে গেছি। ভূত নয়। ভূতুড়ে মানুষরা থেকে যায়। তারপর একটা সময় আসে যখন অনেকেই ভূতের ভয় পেতে শুরু করে।

— তালিবানরা তোমাকে ধরেছিল খবরটা পেয়েছিলাম। এরপর যেটা ভাবা সম্ভব সেটাই ভেবে নিয়েছিলাম।

— সেটাই হবার কথা ছিল। কিন্তু হলো না।

— কেন?

— লাক্ বলতে পার। আমাকে একটা জিপে ওরা নিয়ে যাচ্ছিল। কাবুলে। রাস্তায় নিজেদেরই পাতা মাইনে জিপটা উলটে যায়। তারপর সে এক বিরাট

pathagar.net

কাণ্ড। মোটকথা পালাতে পেরেছিলাম। রাস্তা ভুল করে রসিদ দোস্তামের এলাকায় ঢুকে পড়ি। ওরাই হেলপ্ করেছিল। তুমি?

— আমি? ওই আছি আর কি। জাপানে আসার কোনো প্রোগ্রামই ছিল না। হয়ে গেল। এসেছিলাম ব্যাঙ্কক্। যাদের পার্টটাইমার সেই ভেনেজুয়েলান কোম্পানি বলল— চলে এলাম।

— রাত্তিরে ওলেগের হোটেলে সময় অনেকক্ষণ আমাদের কেউই খেয়াল করেনি। ওর হোটেল থেকে বেরিয়েছিলাম দুটোয়। গোটা রাস্তাটা এগিয়ে দিয়েছিল ও। রাস্তায় যে কথা হয়েছিল সেটা বলার জন্যেই এই গল্প।

— তোমাকে যেটা বলা হয়নি। একটা সিগারেট মাত্র। গলয়েজ— এটাই কি তোমার ব্র্যান্ড?

— না। এখানে আমার ব্র্যান্ড পাব না। অ্যামেরিকান সিগারেট খেতে পারি না। বড্ড সিন্থেটিক লাগে।

— হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম। দুহাজার সালটা আমি মোটের ওপর আরব দুনিয়াটায় কাটিয়েছি, বুঝলে।

— কেন?

— দেশবিদেশ মিলিয়ে অনেকগুলো অ্যাসাইনমেন্ট পেয়ে গিয়েছিলাম। জাপানেও এসেছি একটা অ্যাসাইনমেন্টে। দোমন কেন্ মিউজিয়ামের ওপর লিখতে হবে। দোমন কেন্ কে জান?

— না।

— আ গ্রেট ফটোগ্রাফার। ফ্যান্টাস্টিক কাজ। লেট্ টুয়েন্টিস-থার্টিস-ফর্টিস-হিরোসিমা-অ্যামেরিকান অকুপেশান—অসামান্য আর্টিস্টিক ডকুমেন্টশান। ওরা এবার একটা স্পেশাল বুদ্ধ সেকশন অ্যাড করেছে। কাল যাব। একটা দিন টোকিও যাওয়াটা পেছুতে পারলে, চলো না। মেমরেবল একটা এক্সপেরিয়েন্স হবে।

— দেখি। হ্যাঁ, কী যেন বলছিলে, আরব দুনিয়ায়...

— একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছিলাম, জানো। সৌদি আরব, ইজিপ্ট, লিবিয়া, এমনকি কুয়েতেও ইয়াং জেনারেশনের ফ্লাইং-এ কি আগ্রহ! যাদের পয়সাকড়ি আছে তারা ফ্লাইং ক্লাবে যাচ্ছে। অন্যরা মাইক্রোসফট্-এর ফ্লাইট সিমুলেটর কিনছে। আমি ভেবেছিলাম সবটাই গ্লোবালাইজেশনের ফ্যাড। অথচ

pathagar.net

ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং খুব সিক্রেটলি কিছুই হচ্ছিল না।

— তোমার কিছু মাথায় আসেনি?

— ধ্যুস! খেলনা নিয়ে যেমন বাচ্চারা খেলে। আর আমি নিজে করে দেখেছি, তোমাকে বলতেই পারি, আমি তো নিজেই দুটো প্রোগ্রাম কিনেছি—মাইক্রোসফ্ট ফ্লাইটা সিমুলেটর ২০০২ আর আ সেঞ্চুরি ইন ফ্লাইট ২০০৪।

— কী হয় ওতে?

— ব্লাডি ট্রুথ—তুমি একটা প্লেন ওড়াতে পারবে। কক্‌পিট কনসোলে থাকবে জয় স্টিক। কি বোর্ড। লেফট্ আর রাইট্ রেডার প্যাডেল। আর কী চাই। আর তোমাদের টাকা মানে পঞ্চাশ টাকার ডলার ধরলে ফ্যাবুলাস একটা ককপিট, কনসোল পেয়ে যাবে, এই ধরো লাখ পাঁচেক—একেবারে রেপ্লিকা।

— তুমি কি জানো যে ৯/১১-র পরে অ্যামেরিকা ঠিক করছিল প্রোগ্রাম-গুলোর বিক্রি ব্যান করবে। অবশ্য করলেও কিছু হতো না কারণ লক্ষ লক্ষ কপি হয়ে গেছে।

— অ্যামেরিকানগুলো ওই রকম। সব সময় ফোবিয়ায় ভুগছে। হলিউড দেখো, সারাক্ষণ মাকড়সা, ভূতুড়ে পুতুল, পোকা, কুমির, সাপ—কিছু না কিছু হরর্ অবজেক্ট ঘেঁটেই চলেছে।

— রিডিকিউলাস! যাই হোক, কায়রোতে একটা ছেলে, বুঝলে, কাফেতে কফি খাচ্ছি, সে ব্যাটা ধরেই নিয়েছে যে আমি পাইলট—যত বলছি, আমি এসব জানি না—শুনবেই না।

— কী বলছিল?

— বলছিল যে সে সেস্না ১১২ এস পি-তে প্রোগ্রাম টিউটোরিয়াল করছে। ট্যাক্সিং অ্যান্ড টেক্-অফ্, স্ট্রেট অ্যান্ড লেভেল ফ্লাইট, টার্নস, স্লো ফ্লাইট, স্টল রিকভারি, স্টিপ টার্ন—সব ঠিক আছে। কিন্তু কিছুতেই প্লেনটা ল্যান্ড করাতে পারছে না—গ্রিনব্যান্ড্-এ সে যাচ্ছে স্ক্রিনে যার মানে হলো ক্র্যাশ বা এয়ারক্রাফট্ ওভারস্রেস্ড্।

— সত্যি বলতে, মানে আফটারথটে, এয়ার ক্রাফটটাও ওর নামানোটা শেখারই কোনো দরকার ছিল না।

একদম অব্‌সেস্ড্ বুঝলে—বলার ফাঁকে ফাঁকে এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে কথা বলছে—টিউন ওয়ান টুয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট সিক্স, কেনেডি টাওয়ার্স—ওয়ান টুয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট সিক্স, ওভার।

পরদিন ওলেগ আর আমি ছিলাম টাকেয়া হোটেলে। জাপান সমুদ্রের ধারে। দোমন কেন্ মিউজিয়াম দেখেছিলাম। কাবুকি মুখোশের একটা ফটো-পোস্টার কিনেছিলাম। চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, কাম্পুচিয়া—সব দেশের বুদ্ধ। হিরোশিমা। টোকিওর রাস্তায় অ্যামেরিকান মিলিটারি পুলিশ ট্র্যাফিক কন্ট্রোল করছে। বিশাল মিউজিয়াম কিন্তু শহর থেকে দূরে। ফাঁকা। ওলেগ আমাকে সোনাই এয়ারপোর্টে সি-অফ করে ইয়ামাগাতায় ফিরে গেল। ফ্লাইট এ. এন. এ. ৮৯৬...

এয়ারপোর্টে আমাদের শেষ কথা—

— ফের দেখা হবে। দাও, তোমার ওই ফরাসি সিগারেট একটা।

— এবারে কোথায়?

— সেটাই তো আমরা জানি না। তবে দেখা ব্যাপারটা এমন যে হয়েই যায়। সান্তোরিটা না কিনে ভালোই হয়েছে বলো।

— ফেলে দিতে হতো।

— আচ্ছা, তোমার দেখা ওই আরব ছেলেরা এখন কী শিখছে?

— ইরাকের পর? জানি না। হয়তো বুবি-ট্র্যাপ বানানো।

— আমার তো মনে হয় স্কুবা ডাইভিং।

pathagar.net

যে ভাবে আপনি প্ল্যানটা করেছিলেন তাতে শেষ কাজটুকু আমরা কিছুতেই মেলাতে পারছি না। থ্রিলার যারা লেখে তাদের বা অনেকেরই মতে ফুলপ্রুফ মার্ডার বলে কিছু হয় না। কিন্তু, বহু খুন ও খুনেকে দেখে আমার তা মনে হয় না।

— আমি আপনার সঙ্গে একমত। তবে যেহেতু ব্যাপারটাতে আমার অভিজ্ঞতা আপনার চেয়ে কিছুটা অন্যরকম তাই বলব আমরা যাই করি, যেভাবেই তৈরি হই না কেন, সবকিছুর পরেও ভাগ্য বা কাকতালীয় যাই বলুন কতগুলো ফ্যাক্টরের ওপরে আমাদের নির্ভর করতেই হয়। বিশেষ করে পোলিটিকাল অ্যাসাসিনেশনের বেলায়। এটার সঙ্গে অবশ্য রাজনীতির কোনো যোগ নেই।

— ভিক্টিম সম্বন্ধে যে ফ্যাক্টগুলো আমরা পেয়েছি তাতে কিন্তু অন্য কথা বলে।

— যে কথাই বলুক আমি শুধু আমার জানার মধ্যে যতটুকু সেইটুকুই বলতে পারি। আমি কোনো রাজনৈতিক অ্যাসাইনমেন্ট নিই না। প্রায়শই নিরীহ লোকদের মারতে হয়। বিনা কারণে। অতটা না হলেও...

— কিন্তু সেরকম কাজ আপনি কখনো করেননি এমনও তো নয়।

— বেশি নয়। দুটো। তবে একটা বলাই ভালো। ক্লোক্ অ্যান্ড ড্যাগার বেশ জমাট লাগে। না?

— দারুণ। সেই স্কুল থেকেই—প্রথমে বন্ড, তারপর ও. এস. এস. ১১৭...

— জাঁ ব্রুস্। প্রথম দিকটা ভালো লাগে। পরে বোকা বোকা হয়ে যায়।

— কি?

— গোটাটাই। পাকুড় হত্যা মামলা মনে আছে?

— আছে।

pathagar.net

— মডেলটা খুব পাল্টালো কি? ১৯৮১ সালে, লন্ডন। বুলগেরিয়ার লেখক জর্জি মারকভকে কীভাবে মারা হয়েছিল জানেন?

— আজ্ঞে না। শুনে মনে হচ্ছে কোল্ড ওয়ার-এর ব্যাপার।

— ঠিক তাই। খুব এফিসিয়েন্ট কাজ। নিখুঁত। একটা ছাতা। বিউটিফুল!

— ছাতা?

— হ্যাঁ। তার মধ্যে ট্রিগার, তার সঙ্গে জোড়া কেবল, রিলিজ ক্যাচ, স্প্রিং পিস্টন হ্যামার, গ্যাস ক্যানিস্টার, পিয়ার্সার এবং ২ মিলিগ্রাম ওজনের বিষ ধরে এরকম একটা পেলেট।

— ২ মিলিগ্রাম! কী বিষ?

— মারকভের পায়ে পোকার কামড়ের মতো একটা ক্ষত ছিল। প্রথমে তো চোখেই পড়েনি।

— কিন্তু, বিষটা কী?

— সেটা জানি না। তবে কোনো একটা ফাইটোটক্সিন। রাইসিন হতে পারে। বুলগেরিয়ানদের কাজ আমার খুব ভালো লাগে। সিগারেট লাইটার রিভলভার। খুব ভালো পারে ওরা। আর একটা প্রবলেম হলো অনেক বিষ আছে যা শরীরে ঢুকে কাজ শেষ করে পালটে যায়। যেমন মিথাইল ফরম্যালডিহাইড হয়ে যায়। এগুলো জানা। অজানা বিষ পাল্টে কী মেটাবোলাইট দাঁড়াবে তা কি সহজে বলা যায়?

pathagar.net

— আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম।

— ভালো লাগল?

— অবশ্যই।

— এসবের মধ্যে ভালো লাগার কিছু নেই। আমার আর বলতে বা ভাবতে ভালো লাগে না।

— তাহলে ক্রাইমটা করলেন কেন?

— ওটা আমার কাজ বলে। অনেকদিন হাত খালি ছিল। হঠাৎ কাজটা এল। আরও ভালো লেগেছিল এই কারণে, যে প্রথমত কোনো কড়া টাইম লিমিট ছিল না, দ্বিতীয়ত আমাকে বলা হয়েছিল খুন না করতে।

— কি হেঁয়ালি করছেন?

— হেঁয়ালি না। তাই শেষ কাজটা করা। ওটা না করলে আমার কিছু এসে যেত না। আমাকে বলা হয়েছিল ওকে ভয় দেখাতে হবে। এমন ভয় যে, এরপর

খুন করার দরকার না হয়।

— কাজটা আপনাকে দিয়েছিল কে?

— এতক্ষণ কথাগুলো শুনে কি মনে হলো যে, নামটা বা নামগুলো আমি বলে দেব?

— সবটাই আমি যেমন ভেবেছিলাম তেমন হলে কী হতো? এরকম কোনো কথোপকথন আমার সঙ্গে কোনো কমবয়সী পুলিশ অফিসারের হতে পারত যদি আমি ধরা পড়ে যেতাম। আমি কোনো ক্লু কোথাও রাখিনি তা কিন্তু নয়। ইচ্ছে করেই রেখেছিলাম। পুরো ব্যাপারটা গুলিয়ে দেবার জন্য। আমাকে ধরা যায় না। তাই?

কলকাতা আমার নিজের শহর। যদিও এখানে আমি লেখাপড়া করিনি। এখানে কোনো কাজের অফারও আমি আশা করিনি। গতবছর বর্ষায়, আমি নিজের ঘরে রাত আটটা নাগাদ ঘুমিয়েছিলাম। রাত দশটায় 'ওয়েটার' আমার খাবার আনে। 'ওয়েটার' হলো বছর বারোর একটি ফুটফুটে নেপালি ছেলে। সামনের গলিটা ডানদিকে যেখানে মোড় নিয়েছে সেখানে এক চীনে বুড়োবুড়ির ছোট্ট হোটেল আছে। সেখানে কাজ করে। খাবার আর সেইসঙ্গে মিনারেল ওয়াটারের একটা বোতল। মদ খেতে আমার জল লাগে না।

আমি প্রথমে ভেবেছিলাম 'ওয়েটার'ই এসেছে। এই ঘুমোলাম আর দশটা বেজে গেল! ঘড়িতে আটটা দশ। দরজা খুলে ঘুমে কুঁচকোনো চোখে যে লোকটাকে দেখলাম তার গায়ে ভিজে রেনকোট, পায়ে কাদামাখা সাদা জুতো। ওই সাদা জুতো দেখলে আমার আগাপাছতলা জ্বলতে থাকে। এই জ্বলুনির কোনো ব্যাখ্যা নেই। সাদা জুতো পরা কোনো লোক কখনো আমার পা-ও মাড়ায়নি, ক্ষতি করা তো দূরের কথা। এই লোকটাকে কেন জানি না সার্কিটে পাসপোর্ট নামে সবাই চেনে, আমিও চিনতাম। পরে জেনেছিলাম যে পাসপোর্ট পদবী হয়। বম্বের দিকে। ওই আমার জন্যে কাজটা নিয়ে এসেছিল।

— কাজটা ঝামেলার। দুদিন অনেক ভেবেছি। একটা একটা করে নাম ভেবেছি। তারপর ক্যানসেল করেছি। চেন্নাইয়ের পার্টি। কোনো কেচ্ছা চায় না।

— তোমার মনে হচ্ছে কাজ-কারবারে মন্দা চলছে?

— কেন, মন্দা চলতে যাবে কেন? এয়ারপোর্ট যতদিন আছে আমার কাজের অভাব?

তাই তো জানতাম। এখন দেখছি যত উটকো কাজ জোগাড় করছ। কে

তোমাকে দিব্যি দিয়েছে এসব করার? খুনজখমের ঝুটঝামেলায় না জড়ালে চলছিল না?

— আমিও চাইনি। কিন্তু একটা পার্সোনাল রিকোয়েস্ট। ফেলতে পারলাম না। তুমি রাজি হলে আমি বেঁচে যাই। তবে ব্যবস্থা একটা কিছু না করতে পারলে আমার খুব বড়ো একটা ক্ষতি হয়ে যাবে। না পারছি গিলতে, না পারছি ওগরাতে। তোমাকে বাড়িতে পাবো ভাবিনি। কি ভাগ্যি যে পেয়ে গেলাম। টাকাটা খারাপ নয়। খরচ যা আছে সব, তারপর আমার কমিশন সব কেটে থোক...

— এক মিনিট।

— আমি দরজাটা খুলে একবার সিঁড়ির সামনের জায়গাটা দেখলাম। সিঁড়িটা ঘুরে উঠছে। গলিটা জানলার তলায়। সেখানেও কোনো গাড়ি নেই। অবশ্য আরও দূরে থাকতে পারে। রেডিওতে এফ. এম. চ্যানেলে ধরলাম। ঘষা কর্কশ শব্দ। কোনো স্টেশন নয়।

— এটা রাখো! একটা কার্টনই পেলাম।

— কী?

— তোমার প্রিয় সিগারেট। ক্যামেল। ফিলটার ছাড়া। আর আমাকে বিশ্বাস করে এফ এম. নয়েজটা অফ করে দিতে পারো। বেইমানি আমি করি না।

— একবার করেছিলে। যদিও আমার সঙ্গে নয়। যাই হোক বলো।

পাসপোর্ট সেই লোকটার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর আর একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ফটো আমাকে দিল।

— আমি এরকম কেস কখনো শুনিনি। লোকটাকে জানে মেরে দিলে চলবে না। ও কাজ করার লোক বিস্তর আছে। ওকে ভয় দেখাতে হবে। মরার ভয়। এমন ভয় যে এরপর লোকটা বোবা বা পাগলও হয়ে যেতে পারে। অথচ কোনোভাবে ফাঁস হয়ে গেলেও চলবে না।

— ভয় খুব বেশি পেলে শক্ থেকে মরেও যেতে পারে। তখন? ঠিক কোনো মাত্রা ছাড়ালে ভয় ফেটাল হতে পারে সেটা মাপার কোনো গ্যাজেট বেরিয়েছে বলে তো শুনিনি।

— সম্ভাবনাটা ওরাও উড়িয়ে দিচ্ছে না। ধরো, একটা এসপার ওসপার হয়ে গেল। সে ক্ষেত্রে আমাদের কিছু করার নেই। অবশ্য কিভাবে কী হয়েছে সে সব যাচাই ওরা নিজেরাই করে নেবে। মরে গেলে তো একটা পোস্টমর্টেম

রিপোর্ট হবেই, সেটা ওরা ঠিক জেনে যাবে। খুব লম্বা হাত। ভালো নেটওয়ার্ক।

— তাহলে ফালতু ঝামেলা হবে না বলছ?

— না। ঝামেলার কী আছে? কাজটা যে পাতি মুরগি জবাই নয় সেটা ওরাও জানে।

— ঠিক আছে।

— এই টাকাটা রইল। তুমি পাবে এর কুড়ি গুণ। খরচখরচা বাদে।

টাকাটা শুনলাম। বর্ষার বাজারে ঘরে বয়ে এসে এরকম একটা আজব অফার। অবশ্য অফার আচমকাই আসে। এই আসার কোনো শীত-গ্রীষ্ম নেই। আবার ফাঁকা বেকার বছরও ঘোরে।

— হুইস্কি খাবে?

— সেরকম খাও এখনও?

— একদম না। কালেভদ্রে। কেউ এলে-টেলে।

— আমারও সেই দাঁড়িয়েছে। ভালো লাগে না। ভালো আড্ডাই হয় না।

— ইন্সিডেন্টালি হুইস্কিটা তোমারই নামে, পাসপোর্ট...

— ও, জানি, বেশ ভালো। প্রিমিয়াম কোয়ালিটি না হলেও, চলে...

সেই রাতেই খাওয়াদাওয়া করে কিছুক্ষণ লোকটার ছবি, ঠিকানা, ফোন নম্বর শেষবারের মতো দেখে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। ছাই কমোডে ফেলে ফ্লাশ করে দিই। সামান্য কাগজ ও ফটো পোড়ার গন্ধ জানলা খুলতে ভিজে বাতাস ডেকে নিল। ওপরে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মহিলা আর তাঁর স্বামী, শ্রীমতী ও শ্রী জোনোভান রোজকার মতো ডিনারের পর কনি ফ্রান্সিস ও জিম রিভস্-এর গান শুনছেন। জিম রিভস্ আমারও খুব প্রিয়।

সেই রাতে একটা স্বপ্নও দেখেছিলাম। অনেক স্বপ্নের মতো সেটাও প্রায় মনে নেই। বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালাচ্ছি। ওয়াইপারটা বার বার আটকে যাচ্ছে। তারপর কি যেন একটা হলো। খুব সাঙ্ঘাতিক কিছু নয়। ভায়োলেন্ট ড্রিম আমি কখনো দেখি না। ঘুমের মধ্যে যে চ্যানেলগুলো আমি ধরি সেগুলো রূপকথা, খেলনা, রাজকন্যা, প্রাসাদ, নিরীহ জন্তুদের দেখায়। বড়োজোর জন্মদিনের কেক কাটা হয়। এছাড়া কোনো ছুরি, রিভলভার, এস্কালেটর, রাতের এয়ারপোর্ট, সানগ্লাস—কিছু থাকে না। ঘুমের মধ্যে ওসব নিয়ে আমার কোনো কাজ নেই।

আমি কিন্তু কাজটা যত সহজ ভেবেছিলাম তা হয়নি। কলকাতায় এখনও কিছু

ADDITIONAL DISTRICT Library, SILIGURI
ACC. No. 37112

পুরোনো আমলের বাড়ি আছে যাতে কাঠের সিঁড়ি ও মেঝে রয়েছে। লোকটা থাকে তিন তলায়। তলায় কয়েকটা দোকান সামনের দিকে। তলায় তলায় ভাড়াটে থাকে আবার পাশের সমান মাপের ফ্ল্যাটে কয়েকটা অফিসও রয়েছে। দিন পনেরো চেষ্টার পর আমার মনে হয়েছিল এটা অন্য কোনো ব্যাপার। ফ্ল্যাটটাতে লোকটার নামে একটা লেটারবক্স থাকলেও লোকটা থাকে না। নয়তো কলকাতায় নেই। সচরাচর এসব ক্ষেত্রে আমরা দরকার না বুঝে খোঁজপত্তর করি না। 'কনট্যাক্ট'-এর সঙ্গে তো নয়ই। লেটারবক্স থেকেও কিছুটা আন্দাজ করা যায়। এত বড়ো বাড়িতে একটা আধবুড়ো দারোয়ান। লোকটা নেশা করে। বউ নেই। তার বোবা নাতিকে নিয়ে থাকে।

আমাকে আগেই বলা হয়েছিল যে, কোনো টাইম লিমিট নেই। এ ধরনের কাজে একটা ঝক্কি থাকে। এক গাড়িতে বার বার যাওয়া যায় না। সেলিম প্রথম দিকে আমাকে দিয়েছিল একটা ফিয়াট। ড্রাইভারের বাঁদিকের দরজাটা ভাঙা। তার জড়িয়ে বাঁধা। গিয়ারবক্সেও গণ্ডগোল ছিল। আমি জানতাম সময়টা যত কাছে আসবে তত আমাকে ঠিক নতুন নয়, তার আগের মডেলের গাড়ি নিতে হবে। চোখে কম পড়ে। কলকাতার পুজো কাটল। দীপাবলির আলো দেখতে দেখতে, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে একদিন দেখলাম ছোটো ছোটো বালব্ দিয়ে যে আলোর খেলার খেলাগুলো লাগানো হয়—সেই চন্দননগরের আলোর কানেকশান খুলছে কয়েকটা ছেলে। ওদের দেখেই, ওই ডাঁই করা তার, বালব, ব্ল্যাকটেপ, নেগেটিভ-পজিটিভ দেখতে দেখতে ভাবনাটা এসেছিল। লোকটার বাড়িটা এমন কোনো জায়গায় কি পড়ে যেটা লোডশেডিং হয় না এমন কোনো পকেট? লোকটার সঙ্গে কেউ থাকে? লোকটার নামটা কি ঠিক? আমি লোকটাকে অন্য নামে চিনি? দেখেছি কখনো? এমনও কি হতে পারে যে, আমাকে যারা কাজে লাগাচ্ছে তারাই লোকটাকে সাবধান করে দিয়েছে! অথবা একই ধরনের কনট্রাক্ট কি তারা লোকটার সঙ্গে করেছে? আমি খুব একটা চেনা নই কিন্তু কেউ কি চিনে রাখেনি? ফটো নেই কোথাও? তা কি হতে পারে? যাদের ভয় পাওয়ার কথা নয় তাদেরও কপাল বিনবিনে ঘামে ভিজে যায়। আবছা, তালকানা, মানুষের নানাবিধ ছলচাতুরিতে খামখেয়ালী হয়ে যাওয়া শীত যে গাড়ির দূষণের ধোঁয়ার সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করেছে সেটাও বোঝা যায় না। ক্যামেল সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে দেখেছিলাম লোকটার ফ্ল্যাটটায় আলো জ্বলছে। পর্দা টানা। ফ্ল্যাটটার মাপ ও প্ল্যান আমি জানি। কারণ লোকটার ওপরের ফ্ল্যাটে যে

এক্সপোর্ট ইনস্পেকশনের অফিসটা আছে সেখানে আমি গিয়েছিলাম। দুবছর আগে মালয়েশিয়াতে হলো ব্রিক পাঠাবার একটা অর্ডার ওরা ক্যানসেল করেছিল সেই ব্যাপারে। পুরোনো মডেলের নাইট ল্যাচ। ওগুলো উঠে যাচ্ছে। আশা করা যায় আচমকা পাল্টে ফেলবে না। আসলে আমাদের কাজের সামনে যে অসুবিধেগুলো থাকে সেগুলো যেমন সরাতে হয় তেমন কতগুলো সুবিধেও না থাকলে চলে না।

বেশ কটা দিন ধরে লোকটাকে আমার দেখা হয়ে গেল। নিজস্ব কোনো সিকিউরিটি বা আলাদা করে কোনো প্রোটেকশনের ব্যবস্থা তার ছিল না। মোটামুটি ছক বাঁধাই চলন। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে একটা বার আছে সেখানে নাবিকরা বেশি যায়। জুয়া খেলে। ওখানে একবার অস্ট্রেলিয়ানদের সঙ্গে অ্যামেরিকানদের একটা দারুণ মারপিট হয়েছিল। ওই তল্লাটে একটু পুরোনো দিনের ওয়াকিবহাল লোকেরা সবাই জানে। আমার তখন বয়স কম। কম দামে লং প্লেইং রেকর্ড কিনতে ওই পাড়ায় যেতাম। ওখানে কয়েকটা বেশ ভালো পুরোনো বইয়ের দোকানও ছিল। এখনও আছে। লোকটা মোটা কিন্তু পুরোপুরি আনফিট নয়। পার্কস্ট্রিটে আমার সঙ্গেই একটা ব্রাশ কনট্যাক্ট জাতীয় হয়েছিল। এসব পরিভাষার বাংলা করা কঠিন। তখনই বুঝেছিলাম, লোকটা ভারী কিন্তু সচল। ভারসাম্য রাখতে জানে। মদ খায় কম। বেশি খাবার খায়। ফল কেনে বেশ পরিমাণে। বাড়ি নিয়ে যায়। লোকটাকে মেরে ফেলার শর্ত দিলে খুব অসুবিধে হতো না। একটা বুলেট যে শুধু তার কাজ করতে পারে তাই নয়, খুনেকে যারা হদিশ করবে তাদের পাগলও করে দিতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের একটা .৩৮ বুলেট (ডি. সি. ৪৩—অর্থাৎ ডমিনিয়ন কার্টিজ ১৯৪৩) আজ দুষ্প্রাপ্য। সেরকম একটা বুলেট স্মিথ অ্যান ওয়েসন রিভলভারেও ব্যবহার করা যায়। তবে নিজেকে আমি খুনে বলে মনে করি না। কারণ খুনেরা ধরা পড়ে এবং প্রায়ই আগ্নেয়াস্ত্রটি থেকে টেস্ট ফায়ারের বুলেট ও বন্দুকের বিশেষ সম্পর্কটিও ফাঁস হয়ে যায়। একটা রিভলভার নিখোঁজ করে দেওয়া কী এমন কাজ যা করা যাবে না। কিন্তু আমার ওপর নির্দেশ ছিল 'পার্মানেন্ট কাস্টডি'র ব্যবস্থা যেন না হয়। কোনো মানে হয়?

মানে একটা হয়। কিন্তু এই লোকটা এমন সাঙ্ঘাতিক কিছু করেছিল—এমন কোনো অপরাধ বা বেইমানি যে কারণে একে মারতে বলা হয়নি। মৃত্যুর খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে কিন্তু মৃত্যু তাকে ছোঁবে না। আশপাশ দিয়ে

ঘুরবে, কথা বলবে, চোখের দিকে তাকিয়ে থাকবে কিন্তু...

বেশ কিছুদিন একটানা বিদ্যুৎ সরবরাহ ঠিক থাকার পর লোডশেডিং আবার শুরু হলো। এন. টি. পি. সি. টাকা না পেলে বিদ্যুৎ দেবে না। কোন পাওয়ার স্টেশনে কত নম্বর ইউনিট বিকল। কয়লার মধ্যে জল। অন্ধকারে দেখেছি আমার বেশ ভালো লাগে। আমার টিবর নামে জনৈক হাঙ্গেরিয়ান বন্ধু ছিল। নাইরোবিতে গাড়ি চাপা দিয়ে তাকে মারা হয়েছিল। সে বলেছিল হাঙ্গেরিতে আমাদের একটা ঠাট্টা আছে। দুরবস্থার চরম বর্ণনা হলো কয়লাখনির তলায় ব্যাঙের গুহ্যদ্বারের নীচে শুয়ে থাকা। এইসব অন্ধকার, কখনো কম সময়ের কখনো বেশ টানা, আমার তেমনই লাগছিল। আমার মাপা অন্ধকার চাই যে সময় লোকটা বাড়িতে থাকে। সেই দাগ কাটা কাটা হিসেব করা অন্ধকারের মণ্ড চাই যা নির্দিষ্ট মাপের কয়লার মতো জ্বলে শুধু সেই আলো দেবে বলে যাতে কিছু দেখা যায় না। সেই অন্ধকার চাই। ঠিক ঠিক না মেলানো গেলেও বাংলা কবিতা আমার অজানা নয়। কত বই কত এয়ারপোর্টে বা ট্রেনে ফেলে এসেছি। কোনো ঝুঁকি না থাকলে ইচ্ছে করেই। কী হয়েছে সেই বইগুলোর? কেউ পেরেছে তাদের পাঠোদ্ধার করতে? না কি ফেলে দিয়েছে বরফে, বালিতে! বইগুলোও কি বুঝতে পেরেছিল যে, যে আঙুলগুলো আলতো করে তাদের পাতাগুলো উল্টে ছিল সেই আঙুলগুলোই নিঃশব্দে, আরও আলতো অনুভবে কী করতে পারে? না বুঝলেই ভালো।

বছর ঘুরল। শীতই চলছে। ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের ভদ্রলোকটির বাড়ি বজবজে। তিনি রোজই লেক গার্ডেন্স স্টেশন থেকে রাতে ফেরার ট্রেন ধরেন। উল্টোদিক থেকে তীব্র শব্দ করে মালগাড়িটা এল আর আমিও ভদ্রলোকের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

— আপনাকে আমার একটা উপকার করতে হবে।

— মানে? চেনা নেই শুনো নেই, হঠাৎ ?...

— তাই তো হয়।

আমি দেখছিলাম একটার পর একটা পেট্রলের গোল ওয়াগন যাচ্ছে তো যাচ্ছেই।

— আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

আরও কিছু কথাবার্তার পর আমরা প্ল্যাটফর্মের একেবারে ধারে চলে যাই।

pathagar.net

আলো পাবার জন্যে।

— এটা আপনার গত বছরের একটা টেলিফোন বিলের জেরক্স। আপনি এলাহাবাদে একটা এস. টি. ডি. করেছিলেন। ভুলে যাওয়ার কথা নয়।

ভদ্রলোকের মুখটা অ্যাকোয়ারিয়ামের মরা মাছের মতো নিরুপদ্রব হয়ে ওঠে।

— নার্ভাস হবেন না। নিন, সিগারেট খান। ওই একই কাজ। এই নাম্বারে ফোন করবেন। এইভাবে...

ভদ্রলোক কিছুটা পরে, টাকাগুলো পকেটে রেখে, ধাতস্থ হলেন।

— ওরা আপনাকে থ্রেট করেছিল। আমি করব না। তাছাড়া আমার কাজটাও আলাদা। আপনার কোনো রিস্ক্ নেই। টাকাটা দেখে নিয়েছেন?

— না।

— এতটাই যখন বিশ্বাস করে ফেলেছেন আমায়, তখন কাইন্ডলি দেখবেন কাজটুকু যেন হয়।

— আপনাকে আর বলতে হবে না।

— না হলেই ভালো। চলি।

কীভাবে আমার কাছে খবরটা আসবে সেটা বুঝিয়ে দেবার সময়ে জ্যাকেটের চেনটা একটু খুলতে ও শার্টের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি স্ট্র্যাপটা দেখতে পেয়েছিল। চেনটা আরও একটু খুলে ভেতরের পকেট থেকে টাকা বের করার সময় বাকিটাও।

— এটা কিন্তু টিপিক্যাল ইন্টারোগেশন বলে ভাববেন না। হলে এতটা এনজয় করতাম কি?

— সে জানি না। এটাকে কী বলা যাবে? ডায়লগ?

— হয়তো তাই। আচ্ছা, আপনার কোনো অনুশোচনা হয় না? ধরুন, কাউকে আপনি মারলেন। তারপর কখনো তার বিধবা স্ত্রী বা বাচ্চাদের দেখলে আপনার খারাপ লাগবে না?

মাথা টিপ টিপ করে আমার। এটা কেমন অস্বস্তি? কি বলব আমি?

— লাগবে। খুবই খারাপ লাগবে। কিন্তু আমার কিছু করার নেই। সেটা সহ্য করতে হবে। কারণ হয়তো একইভাবে নিজেকেও শেষ হতে হবে। একটা একটা করে কাজ শেষ করার মানে হচ্ছে শেষ কাজটার জন্য নিজেকে তৈরি করা।

pathagar.net

— সেটা কী?

— একইভাবে মরে যাওয়া।

— যেমন?

— কোনো নির্জন ফুটপাত দিয়ে হাঁটার সময় পাশে একটা গাড়ি হঠাৎ ব্রেক কষতে পারে বা স্লো হতে পারে। আমি যখন ঘরে ফিরি ভেতরে কেউ অপেক্ষায় থাকতে পারে। বা কোনো এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস। সেটা খুব সূক্ষ্ম কাজ হতে পারে। তবে এদিকে চল কম। অবশ্য সবাই সবটা ভালো পারে না। এ ব্যাপারে আইরিশদের কাছে, চেকদের কাছে অনেক কিছু শেখার আছে।

— আপনি শিখেছেন?

— খুব একটা নয়। খুব স্পেশালাইজড কাজ। সফেস্টিকেটেড এসপিওনাজ গ্যাজেটের মতো। দারুণ ফ্যাসিনেটিং।

— এসপিওনাজের পৃথিবীটা সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা কতটুকু।

— কিছু কিছু জানি। বেশি জানি বললে মিথ্যে বলা হবে। খুব কষ্টের খুব ঝামেলার কাজ। ভায়োলেন্স বা গ্ল্যামার—কোনোটাই নেই। ফিল্মে যত ফালতু ব্যাপার দেখায়।

— সেখানেও তো খুন-জখম হয়।

— হাতে গোনা যায়। পেনকভস্কি বা অ্যামেস কি একটাও খুন করেছিল? করেনি। বা ফিলবি? লন্সডেল? ম্যাকলিন? বার্জেস? আমাদেরটা একদম আলাদা।

— আচ্ছা, এক অর্থে আপনারাও তো সিরিয়াল কিলার।

— পর পর খুন করার কারণে?

— ঠিক তাই।

— তা বোধহয় নয়। সিরিয়াল কিলাররা একটা প্যাটার্নে পড়ে। আমরা পড়ি না।

— কেন?

— আমাদের মোটের ওপর একরকম ছকে ফেলা যায় না। ওরা মানসিক ভাবে অসুস্থ—

— আপনারা নন?

— না। আমরা পেশাদার। ওরা মারে অন্য কারণে। ক্রিশ হ্যানসন বেশ্যাদের নিয়ে নিজস্ব প্লেনে করে জঙ্গলে বা পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিত। তারপর জন্তু-জানোয়ার যেভাবে শিকার করে সেভাবে মারত। ও কতগুলো মেয়েকে মেরেছিল জানেন?

pathagar.net

— না।

— ১৮৭ জন। ভাবুন। আমরা পারব? অবশ্য এরকম ঘটনা বোধহয় অ্যামেরিকাতেই সম্ভব।

— অন্য কোথাও এরকম হয়নি?

— হবে না কেন? বম্বেতে হয়েছে। কলকাতাতে ওই পাথর দিয়ে মারা। লেনিনগ্রাদে একজন ইঞ্জিনিয়ার সন্ধেবেলায় বেলচা দিয়ে বাচ্চাদের মার্ডার করত।

— এটা কি সোভিয়েত আমলে?

— হ্যাঁ। সেই জন্যেই তো লেনিনগ্রাদ বললাম। আপনি কখনো রাশিয়ায় গেছেন?

— না।

— মস্কোতে লুবিয়ানকা প্রিজনের নাম শুনেছেন?

— হ্যাঁ।

— ওরই পেছনে একটা কেজিবি মিউজিয়াম রয়েছে। গেলে দেখবেন। দারুণ ইন্টারেস্টিং।

এভাবে কারো সঙ্গে কথা বলার সুযোগ কি আমার হবে? জানি না। আমাদের কথা বলা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়। খুব বেশি লোক জানতেও পারে না।

pathagar.net

সেলিমের লোক এসে আমাকে নম্বরটা দিয়ে গেল। ফোন নম্বর। প্রথমেই বেলারির এস. টি. ডি. কোড। পরে যে কারণে বেলারি বিখ্যাত হয়েছিল তার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ০৮৩৯২ হলো বেলারির কোড। এটা ব্যাঙ্গালোরের ০৮০ বা ভাতিন্দার ০১৬৪-ও হতে পারত। হলে মানেটা পাল্টে যেত। অনেক কেবল-জয়েন্টেই জোড়াতালি রিপেয়ার থাকে। কাজ চালানো গোছের। বর্ষা না কাটলে বড়ো কাজে হাত পড়ে না। এরপর যে পাঁচ সংখ্যার ফোন নম্বরটা ছিল তার মধ্যে ছিল তারিখ ও মোটামুটি অন্ধকারের মাপ। আমি দেড় থেকে দু-ঘণ্টা সময় পাব।

আমার হাতে একটা দিন সময় ছিল। সাউথে আমার এক বিবাহিতা বান্ধবী থাকে। তার লকারে আমি একটা জিনিস রাখি। খুব দরকার না পড়লে সেটা আমি নিই না। এমনিতে আমার ওই ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট যদি সার্চ করা হয় তাহলে কিছুই পাওয়া যাবে না। একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ১৪ ইঞ্চি টিভি।

কিছু বই। একটা লজঝড়ে টুইনওয়ান। কিছু ক্যাসেট। বড়োজোর বোঝা যাবে আমি ব্রায়ান ইনোর ভক্ত বা গ্রাহাম গ্রিন পড়ি। ওয়াইল্ড লাইফ-ও পছন্দ করি। আমার কেবল-কানেকশন নেই। টিনের নারকোল তেল ও পাতি দেশি শ্যাম্পু ব্যবহার করি। কয়েকটা পছন্দসই মিষ্টির দোকানের বাক্সও চোখে পড়বে। একটা হাতপাখা। ধুলোপড়া টেবিলের ওপরে একটা ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে ও তার মার সঙ্গে আমার ছবি। পেছনে দুটো তাজমহল। একটা আকাশে, একটা জলে। কয়েকটা নানা মাপের জ্বলে যাওয়া মোমবাতি। রুটি ও ফল কাটার একটা খুবই সাধারণ ছুরি যার ফলায় ফলের কালো কষ শুকিয়ে রয়েছে। তোশকের নীচে পুরোনো খবরের কাগজ। খাটের তলায় ধুলো পড়া একটা বুল-ওয়ার্কার, একটা ভালো সুটকেস যার মধ্যে অনেকগুলো ন্যাপথালিনের বল যারা অনেকদিন ধরে ছোটো হতে হতে একসময় মিলিয়ে যাবে। কিছু সাধারণ জামাকাপড়। লুধিয়ানার সোয়েটার। আমার ফোন নেই। মোবাইল নেই। ক্রেডিট কার্ড নেই। এরকমই সাদামাটা আমার ঘর। একটা আধখাওয়া স্কচের বোতল। এখানেই পাওয়া যায়। পাসপোর্ট যে গেলাসটায় হুইস্কি খেয়েছিল তার গায়ে বাঁ হাত বাড়িয়ে একবার অ্যাশট্রে নিয়েছিল। চলে যাওয়ার সময় ভেতরে ভোর-নবটা ঘুরিয়েছিল। কোথাও তার কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই। 'ওয়েটার' আর আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে।

সেলিমের কাছে যাওয়ার আগে একবার চাঁদনি যেতে হবে। একবার যোধপুর পার্ক। রাস্তার ধার থেকে একজোড়া স্নিকার কিনতে হবে। বাকি সবই নানা জায়গায় রাখা আছে। ওর পাশের বাড়িটা একটা নার্সিংহোম। সেটাও পুরোনো দিনের। দুটো বাড়ির ছাদের মধ্যে গ্যাপ খুব কম। সাতটা অবধি ওদের ভিজিটিং আওয়ার। সাড়ে ছটায় পাওয়ার কাট হবে। জেনারেটর চালু করতে কয়েক মিনিট সময় লাগবে। লোকটা ওর ফ্ল্যাট থেকে সচরাচর সাড়ে সাতটা নাগাদ বেরোয়। সাদা নয় এমন একটা মারুতি ৮০০ চাই। অবশ্য পাওয়ার না থাকলে আগেও বেরোতে পারে। গরমের সমস্যা যদিও নেই। নেল-ক্লিপার দিয়ে হাতের নখগুলো কাটার সময় আমি পর পর কী করব সেই ছবিগুলো দেখে নিয়েছিলাম। ব্যাপারটা কিছু এমন নয়। কিন্তু সামনে অনেক সময় ভ্যাবলা বোকা লোক পড়ে যায়। তারা চিৎকার করতে পারে। বা চুপ করেও থাকতে পারে। ভয় পেয়ে গেলে। অনেক সময় ঢাকাচাপা কিছুই থাকে না। খোলাখুলিই কাজ করতে হয়। সময়টাই হলো আসল। সময়টাকে কাজে লাগানো। ৬টা ৪০ মিনিটে সব অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

pathagar.net

পুরোনো দিনের কাঠের দরজা। ঘরের মধ্যে একটা মোমবাতি জ্বলছে। ও হাঁটছিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ জামাকাপড় ছাড়ার খস খস শব্দ। দেশলাই জ্বালল। দোতলায় কারা কথা বলছে। জেনারেটরের আলো কিছুটা ঢোকে। তলায় কেউ স্কুটার স্টার্ট দিচ্ছে। লোকটা গান করছে। বাথরুমে ঢুকল মোমবাতি নিয়ে। কল থেকে বালতিতে জল পড়ার শব্দ। নাইট ল্যাচটা খুলে গেল। শব্দ প্রায় হয়নি। লোকটা গান করছে। বড়ো টেবিল ল্যাম্পটাকে লোক বলে ভুল করতে গিয়েছিলাম। শাওয়ার খোলার শব্দ। আমি বাথরুমের দরজা খুললে যে দিকে পাল্লাটা যায় তার উল্টোদিকে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ফ্লাশ টানার শব্দ। লোহার সিসটার্ন। ঘটাং করে শব্দ হয়। শাওয়ারের শব্দ। ঘরে দুটো চেয়ার। একটায় হাতল নেই। সেটাই আমার কাজে লাগবে। লোকটা দরজা খুলল। সাবানের গন্ধ। আলোছায়া। এখনও গান করছে কিন্তু ঠান্ডা লাগছে বলে গলাটা কাঁপছে। লোকটা বেরোল। ন্যাংটো। মোমবাতিটা পড়ে নিভে গেল। ওর বাঁদিকে ঘাড় আর গলার কাছে মেরেছিলাম। পড়ে যাওয়ার আগে ভারী বডিটা ধরেও নিতে হয়েছিল। কাঠের ফ্লোরে পড়লে শব্দ হতো। সিঙ্গল খাটের কোণটাও মাথায় লাগতে পারত। এ ধরনের আঘাত অনেক সময় মারাত্মক হয়ে যায়।

মুখে জলের ঝাপটা দিতে লোকটা প্রথমে গোঁ গোঁ করল কিছুক্ষণ, তারপর চোখ খুলল। আমি ওর সঙ্গে কোনো কথা বলব না। ও আমাকে চিনতেও পারবে না। কালো উইন্ডচিটার আর অলিভ গ্রিন জিনস পরেছিলাম। হাতে কালো স্কিন টাইট ল্যাটেক্স দস্তানা। কালো ঠাসবুনোট নেটের মাথা ঢাকা মুখোশ। চোখে দুটো ফুটো। লোকটা চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা। চেয়ারটা ওই একই নাইলনের দড়ি দিয়ে জানালার গ্রিলের সঙ্গে এমনভাবে বাঁধা যে শরীরের ঝাঁকুনিতে চেয়ার নিয়ে উল্টে পড়া যাবে না। মুখে ওরই গেঞ্জি গোঁজা। লজ্জা ঢাকার জন্য কোমরের ওপর দিয়ে একটা তোয়ালে ফেলা। ঘরে দুটো মোমবাতি জ্বলছে। আমার মুখে চিউইং গাম। চিবোচ্ছি। লোকটা ঘামছে। পকেট থেকে এবার আমি বের করলাম।

লম্বা একটা ইলেকট্রিক তার যার একটা দিকে নেগেটিভ-পজিটিভ-এর প্যাঁচ খোলা এবং বেশ কিছুটা ধাতব অংশ বেরিয়ে। ইলেকট্রিক তারের অন্য মুখটা তিনটে তারের রাস্তা ধরে গিয়ে শেষ হয়েছে একটা টুপিন, একটা ৫ অ্যাম্পিয়ার থ্রিপিন ও একটি ১৫ অ্যাম্পিয়ার থ্রিপিন প্লাগে। ওর দুটো পায়ে ধাতব তারগুলো জড়িয়ে বাঁধার সময়ে দেখলাম দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে। অ্যাডেসিভ

pathagar.net

টেপের টুকরোগুলো আলগা হয়ে যেতে পারে তাই বাঁধতে হলো। লোকটা বুঝতে পেরেছিল কী হতে চলেছে। আমার কথা বলার সুযোগ থাকলে লোকটার সঙ্গে অন্তত একতরফা একটা গল্প করা যেত। কেমন হতো গল্পটা?

অ্যামেরিকানরা একেই বলে ইলেকট্রিক চেয়ার। বুঝলেন? তবে ওখানে ভয়ঙ্কর বেশি পাওয়ারের কারেন্ট আসে। বডি ঝলসে পুড়ে যায়। অবশ্য আর একটা সিস্টেমও আছে। সায়ানাইড পিল তলায় অ্যাসিডের মধ্যে পড়ে। তারপর কিলার গ্যাসটা নিচ থেকে ওপরে উঠছে, ওর নাক আর মুখের কাছে আসছে। তখন ও ছটফট করে মাথা সরাতে চেষ্টা করে। বাইরে থেকে কাচের মধ্যে দিয়ে সবটা দেখা যায়।

এরপর আমি কাছাকাছি সুইচ বোর্ডটা দেখলাম। থ্রিপিন সকেট থেকে টিভির প্লাগটা খুললাম। তারপর থ্রিপিন প্লাগটা ঢুকিয়ে দিলাম। পাশের সুইচটার দিকে ও তাকাচ্ছে। অনেক সময় পাশের সুইচটা ওই প্লাগের নাও হতে পারে। ১৫ অ্যাম্পিয়ারের আর টুপিন প্লাগটা কাজে লাগল না। টেবিলের ওপরে লোকটার ঘড়ি, ওয়ালেট, ডট পেন, কিছু খুচরো পয়সা। কোনো এক সাধুর ছবি। শুকনো মালা পরানো। আমার কাজ শেষ। এবারে আমাকে আর একটা কাজ ভেতরে করতে হবে। দেখলাম ধূপের একটা প্যাকেট রয়েছে। ধূপদানিও রয়েছে। দুটো ধূপ জ্বেলে দিলাম। মোমবাতি দুটো নিভিয়ে দেবার আগে সবটা একবার দেখে নিলাম। তারপর সুইচ বোর্ডের সবগুলো সুইচ অন করে দিয়ে মোমবাতি দুটো ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ডোর ল্যাচটা খুলে বেরিয়ে এসে দরজাটা টেনে দিলাম।

নীচে অন্ধকার। দারোয়ানটা বাইরে কারো সঙ্গে গল্প করছে। সিঁড়ির তলায় মেন সুইচের ডালাটা খুলে ফিউজটা পকেটে নিয়ে বাড়ির পেছনে দিয়ে ঘুরে গেটের দিকে এলাম। বোবা বাচ্চাটা চেঁচাল। দারোয়ান ঘরের দিকে গেল। আমিও বেরিয়ে গেলাম।

এবার আমাকে এলোপাতাড়ি কিছুটা ঘুরতে হবে। জুতো পাল্টাতে হবে। উইন্ডচিটারটা দুদিকেই পরা যায়। ভেতরটা লাল। সস্তার স্নিকারদুটো দূরে ফেলে দিতে হবে। সেলিমের গ্যারেজের পেছনে মবিল মোছা তুলোর আগুনে দস্তানা আর মুখোশটা জ্বালিয়ে দিতে হবে। গাড়িটা সেলিম মুছবে। হাতল, গিয়ারের ওপরটা, স্টিয়ারিং, আলোর সুইচ, গাড়ির চাবি—সব। আজ রাতেই গাড়িটার সার্ভিসিং শুরু হবে। অন্য চারটে টায়ার লাগবে এবং এই টায়ারগুলো অন্য গ্যারেজে চলে যাবে। আসল নাম্বার প্লেটটা ফিরে আসবে।

BanglaBook.org

সেলিমের গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সাউথে, যোধপুর পার্কে, আমার সেই বিবাহিত বান্ধবীর কাছে গিয়ে জিনিসটা রেখে এসেছিলাম। ও আবার কাল লকারে রেখে আসবে। সেখানে থেকে ফেরার রাস্তায় মনে হলো কিছু খেতে হবে। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে এ. এ. ই. আই. ক্লাবের একটা বাইরের কাউন্টার আছে। সেখানে ট্যাক্সি ছেড়ে একটা রোল খেলাম। খুব নেশা করতে ইচ্ছে হলো। একটা বোঝা ঘাড় থেকে নেমে গেলে এরকম হয়। কিন্তু বেসামাল আমি কখনো হই না। খুব বেশিক্ষণ হাঁটতে হবে না। লাউডন স্ট্রিটে একটা ওপেন-এয়ার বার আছে। আমার টেবিলে যে মহিলার ছবি আছে তার সঙ্গে কয়েকবার আমি ওখানে গেছি। অনেক বছর আগে। লনে নীল আলো জ্বলত। আর ঘাসের ওপর কয়েকটা বেড়াল ঘুরে বেড়াত। আজ আমাকে নিয়ম ভেঙে রাম খেতে হবে। আজ আমার নেশা হওয়ার কথা। এরপরে আমার আর খেতে ইচ্ছে করবে না। 'ওয়েটার' খাবার নিয়ে এসে ফিরে যাবে। এরকম আগেও কখনো কখনো হয়েছে। অন্ধকারে আমি ব্রায়ান ইনো শুনব। টোনটা পুরো অফ না করে দিলে চিড়চিড়ে শব্দ করবে। ভল্যুমও থাকবে খুব কম। আমি ঘুমিয়ে পড়ব। ক্যাসেটটা শেষ হয়ে গেলে নিজের থেকে অফ হয়ে যাবে। কোন স্বপ্ন দেখব আজকে? বাগানের মধ্যে শীতকালের সব ফুল—প্যানসি, ফ্লকস্ নানারঙে ফুটেছে। তার মধ্যে একটা ছোট্ট মেয়ে খরগোশের মুখোশ পরে আমাকে ডাকছে। আমি বলব আসছি।

আমার ফিরতে ফিরতে পৌনে এগারোটা হয়ে গিয়েছিল। চাবি ঘুরিয়ে ঘরে ঢুকে দেওয়ালের নীচের দিকে লাগানো সুইচটা পা দিয়ে অন করেছিলাম। যেমন রোজই করি। নেশাটা কি একটু বেশি হয়েছিল? একেবারে না বোঝার তো কোনো কারণ নেই। আমার খাটে সেই মোটা লোকটা আধশোয়া। হাতে গ্লাস। চেয়ারে বসে পাসপোর্ট। সেও হুইস্কি খাচ্ছে।

— কনগ্র্যাচুলেশন। তবে ঘাড়ের বাঁদিকে একটু বেশি জোরে মেরেছিলে। অবশ্য শিওর হয়ে নেওয়াই ভালো। আই রিয়্যালি লাইকড্ ইয়োর পারফরমেন্স। অনেক ড্রিংক করে আছো। আর খাবে?

— একটা

— ঢালো। এটা রিয়্যাল গুড হুইস্কি। কুইন অ্যান।

পাসপোর্ট ঢালে। বাড়িটা ওরা বেশ নিজের করে নিয়েছে।

pathagar.net

— আমি সবটা জানলেও খুব নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল হঠাৎ যদি পাওয়ার ফিরে আসে।

— এলেও কিছু হতো না। এটা ডামি তার। তাছাড়াও ফুলপ্রুফ হওয়ার জন্য আমি নীচের মেন থেকে ফিউজটাও খুলে নিয়েছিলাম।

— জানি। খুব ভালো প্ল্যান। তুমি ইচ্ছে করলে বাকি টাকাটা সিঙ্গাপুরে তোমার যে অ্যাকাউন্ট আছে সেখানেও নিতে পার। অথবা বম্বেতে। যেখানে খুশি।

— এক্ষুনি বলতে হবে?

— তা নয়। কিন্তু আমারও তো ক্রেডিবিলিটি বলে একটা জিনিস আছে। এই টাকাটা রাখো।

আমি টাকাটা নিয়ে টেবিলে রাখি। এক চুমুক খাই। সিগারেট ধরাই।

— আই অ্যাম সরি। এই মুহূর্তে আমার আইডেন্টিটি জানাতে পারছি না। তবে তোমাকে আমাদের দরকার। বেইরুট তোমার চেনা?

— খুব ভালো নয়।

— পরশু সন্ধেবেলায় তুমি এয়ারপোর্ট হোটেলে এসো। ওখান থেকে আমরা একটা জায়গায় যাব। সেখানে অন্যরা থাকবে। কথা হবে। চিন্তার কিছু নেই।

— বুঝলাম না।

— আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। কাল গিয়ে লকার থেকে ওটা নেবার জন্য মেয়েটিকে বিরক্ত করার কোনো দরকার নেই। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করতে পারো। আমরা চলি। তুমি শুয়ে পড়ো। এইটুকু জেনে রেখো বেইরুটে পৌঁছোনোর আগে অবধি তুমি আমাদের ইনভিজিবল কাস্টডিতে রয়েছ। ইচ্ছে করলে দরজাটা খুলেও ঘুমোতে পার।

ওরা চলে যাবার পর আমি আর একটু হুইকি খেলাম। তারপর আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। ব্রায়ান ইনোর ক্যাসেটটা বাজছিল।

১৯৯৯

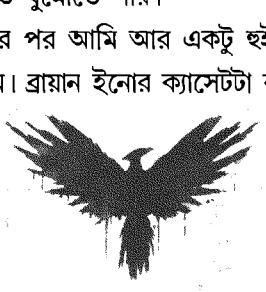

pathagar.net

চীন ২০০২

এইটা হলো শিয়ান স্টেশন। মধ্য চীনের শান-সি প্রদেশের রাজধানী। সেখানে তখন বিকেল। আলো কমে গেলে স্টেশনের বাইরে হোটেল, দোকান, বাজার সব আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে। দোতলা, তিনতলা সমান এক একটা হোর্ডিং। আলোয় সচল মনে হয় তাদের—ম্যাকডোনাল্ডস, কেনটাকি ফ্রায়েড চিকেন, এরিকসন, লাকোস্তে, আডিডাস—তারা এত আলোকিত ও এত উঁচু যে যেন এক একটা জাহাজ। মানুষের ফেনার মধ্যে ভাসছে।

বুড়ো দিং একটা ফেলে দেওয়া সিগারেট পেয়েছিল। দামি সিগারেট। হংতাশান। চারটে তুখোড় ছেলে হেলায় ট্যাক্সিতে উঠে যাওয়ার সময়, তাদেরই কেউ, সিগারেটটা ফেলে দিয়েছিল বাইরে। সেটা খেয়ে দিং অর্থাৎ তেষট্টি বছরের দিং ইয়ংশেন কিছুক্ষণ ঝিম মেরে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের লোহার রেলিংএর ওপরে বসেছিল। ওর বাঁ হাতটা শুকনো। সরু ডালের মতো। কোনো কাজে লাগে না। তাই সব ভারি কাজ করতে করতে ডান হাতটা অস্বাভাবিক জোরালো হয়ে গেছে। ও পরেছিল একটা রং চটে যাওয়া, ছিঁড়ে যাওয়া ট্র্যাক স্যুটের ওপরের অংশটা আর একটা হাফপ্যান্ট যার ঠিক ইংরেজি হলো শর্টস্। একটু দূরে একজন পুলিশ ট্যাক্সি ড্রাইভারদের সঙ্গে ঠাট্টামস্করা করছিল। একটা ট্যাক্সির বনেটের ওপর বসে। ট্যাক্সিটা হলো সানতানা ২০০০—জার্মান ফোক্স্ওয়াগন কোম্পানির গাড়ি। দিং আন্দাজে ঠাহর করল যে এক্সপ্রেস ট্রেন কে-৭৬১ আসতে আরও আধ ঘণ্টাটাক দেরি আছে। এই সময়টা কিছু করার নেই। ঝিমোনো ছাড়া। ঝিমোনোটা একটু ঘুমের দিকেও টাল খেতে পারে। দিং তার গলায় জড়ানো লম্বা নাইলনের দড়িটা একটু আলগা করে দিল।

চীনের অন্যতম বিলাসবহুল দ্রুতগতি ট্রেন কে-৭৬১-তে সেদিন শিয়ান-এ আসছিল ভারতীয় লেখকদের একটি দল। আর অ্যামেরিকান, জাপানি, অস্ট্রিয়ান ও অন্যান্য দেশের ট্যুরিস্টরা তো রোজকার মতো থাকবেই। এই ট্রেনটি ডবল-ডেকার। ভেতরের ব্যবস্থা খুবই কেতাদুরস্ত। নীল ও সাদা ইউনিফর্ম পরা সুন্দরী

pathagar.net

মেয়েরা যাত্রীদের দেখভাল করে। ফুলদানিতে ফুল থাকে প্লাস্টিকের। নেসকাফে, ঠান্ডা লঘু পানীয় বা মদ পাওয়া যায়। রুবিকের কিউব বা অন্য নানারকম ধাঁধার খেলা বিক্রি হয়। পা ছড়িয়ে বসা যায়। বড়ো বড়ো জানলা কাচের। তার পর্দা সরিয়ে বাইরে দেখা যায়। পাহাড়ের পর পাহাড়। তার ফাঁকে ফাঁকে বাড়ি। আচমকা শুরু হয়ে যায় সুড়ঙ্গ। তার মধ্যে পর পর চলে যায় আলো। আসে একেবারেই গ্রাম্য প্ল্যাটফর্ম। তুচ্ছ। এসব জায়গায় কে-৭৬১ দাঁড়ায় না। আবার আসে ছোটো শহর। সব শহরেরই থাকে শহরতলি যেখানে এখনও রয়েছে ঠাসবুনোট বস্তি বা আগের যুগে বানানো লাল লাল ব্যারাকের মতো দেখতে বাড়ি। এসব যাতে চোখে না পড়ে তাই কখনো কখনো দেখা যায় রেললাইনের পাশেই ধাতব পর্দার দেওয়াল। আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার। রেললাইনের ধারে মাঠ, গাছপালা, ক্ষেত কিন্তু পাখি বলতে গেলে নেই। ক্বচিৎ কখনো একটা দুটো চড়াই। দুষ্প্রাপ্য। ধান খেয়ে ফেলার অপরাধে চীন দেশে একবার শুরু হয়েছিল চড়াই মারার অভিযান। চড়াই গুলি করে মারা কঠিন। আর কত ছররা জোগাবে কমিউনিস্ট পার্টি। তাই ক্যানেস্তারা বাজিয়ে চড়াইদের তাড়িয়ে উড়িয়ে বেড়ানো হতো। উড়তে উড়তে ডানার ক্লান্তিতে যখন তারা মাটিতে পড়ে যেত তখন মারা হতো পিটিয়ে। এরকম করে চড়াইরা যখন প্রায় নিঃশেষিত তখন শুরু হলো ধান ক্ষেতে নানা জাতের পোকাদের বিধ্বংসী অভিযান। তখন বোঝা গেল যে চড়াইদেরও দরকার রয়েছে। বন্ধ হলো চড়াই নিধন। কিন্তু এখনও তারা সংখ্যায় বড়ো কম। কেন? সম্ভবত উন্নততর চাষে অত্যধিক কীটনাশক ব্যবহার হয় বলে। দিং ঢুলে পড়ছিল ঘুমে। সে থাকে শিয়ান শহরের প্রান্তে। স্টেশনের পেছনে, মালঘরের লাগোয়া দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দিংএর সাইকেল। তারও বয়স কম হলো না। সস্তায় পেয়ে গিয়েছিল দেশি ওষুধের হাটব্যবসায়ীদের একজনের কাছে। সে বিক্রি করে গুবরে পোকা আর বাচ্চা কাঁকড়াবিছে। দিং চটকা ভেঙে উঠল। ঝাঁকিয়ে নিল মাথা। আলস্যের এটা সময় নয়। পাশে রাখা ছোটো প্লাস্টিকের বোতল থেকে জল খেল একটু। দিং-এর বউ বোতলটা পেয়েছিল কুড়িয়ে। দিং উঠে দাঁড়াল। দিং-এর মতো আরও যারা আছে তারাও জমা হতে শুরু করেছে প্ল্যাটফর্মে। প্ল্যাটফর্মের দিকে হাঁটতে হাঁটতে দিং গলায়-জড়ানো দড়িটা নিয়ে একটু চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। দড়িটার ধক্ কমে আসছে। গিঁট দিতে হয়েছে।

দশজন ভারতীয় লেখক ও তাদের দুজন চীনা গাইড ট্রেন থেকে নামতেই তাদের ওখানে মাছির মতো ছুটে গিয়েছিল কুলিগিরি করার জন্যে একপাল বুভুক্ষু

pathagar.net

মানুষ। এদের মধ্যে ছিল বলিষ্ঠ কয়েকটি যুবক, তিন চারটি কম বয়সী মেয়ে আর জনা পাঁচেক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ যাদের মধ্যে বুড়ো দিং-ও ছিল। কে নেবে সুটকেস, কে নেবে ট্যুরিস্ট ব্যাগ তাই নিয়ে চেঁচামেচি, হাতাহাতি। যুবকদের দাপট বেশি কিন্তু মেয়েরাও কম যায় না। বার দুয়েক যুবক দিং-কে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল সপাটে। তার শুকনো, কুঁকড়ে যাওয়া বাঁ হাতটা নিয়ে ঠাট্টাও করেছিল। কিন্তু সুটকেস আর ব্যাগগুলো যখন ট্রেনের বগির মাঝখানে, বিশেষ দরজা খুলে নামানো হচ্ছে তখন দিং-ই ওই যুবকটিকে ডান হাতে এত জোরে ধাক্কা দেয় যে সে পড়ে যায় এবং দিং-এর চোখ দেখে কিছুটা ঘাবড়েও যায়। দুটো বড়ো সুটকেস দখল করে নিল দিং। দুটো সুটকেসের হাতলে নাইলনের দড়িটা বাঁধতে বাঁধতে দরদস্তুরও করে নেয় দিং। বাইরে অপেক্ষায় দাঁড়ানো বিশেষ বাস অব্দি দুটো সুটকেস নিয়ে যাওয়ার জন্যে সে বেশি নয়—পাঁচ, পাঁচ মোট দশ ইউয়ান চায়। বসে পড়ে দিং। নাইলনের দড়িটা কাঁধ দিয়ে উঁচু করে। বুকে আর পিঠে ঝুলতে থাকে দুটো বিশাল ভারি সুটকেস। প্ল্যাটফর্ম থেকে বাস অব্দি অনেকটা পথ। এর মধ্যে খুব বেশি না হলেও কিছুটা চড়াই ও উৎরাইও আছে। দুটো সুটকেসের দুই লেখক মালিক দিং-এর সঙ্গে হাঁটার গতিতে তাল রাখতে হিমসিম খায়। দিং এরকম রোজ করে। বার বার করে। মাল বাসে তুলে দেওয়ার সময়ে জনৈক ভারতীয় লেখক দিং-কে একটা সিগারেট দিয়েছিল। দিং সেটা তখনই ধরায় না। ট্র্যাকস্যুটের পকেটের মধ্যে রাখে। হাফ প্যান্টের পকেট থেকে প্লাস্টিকের জলের বোতলটা বের করে ছিপি খুলতে থাকে। বাস ছেড়ে দেয়।

চীনা দুই গাইডের মধ্যে একজন পুরুষ। সে চীনা লেখক ইউনিয়নের কর্মচারী এবং কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। বাসে ট্যুরিস্টদের কাছে বলার মাইক্রোফোনটি নিয়ে সে বলতে শুরু করে,

— 'ভারতীয় লেখক বন্ধুরা এইমাত্র শিয়ান স্টেশনের প্লাটফর্মে যে ঘটনা দেখছেন তার জন্য আমি দুঃখিত। আমিও জানতাম না যে এমন একটা কিছু ঘটবে। আসলে কী জানেন—এরা হলো কৃষক এবং শৃঙ্খলা ব্যাপারটাই এরা জানে না। চীনে যে বিশাল অর্থনৈতিক সংস্কার চলছে তার মধ্যে এদের খাপ খাওয়ানো খুবই কঠিন কাজ। গ্রাম থেকে এরা আসে। আসেই। তবে এ ব্যাপারে আমি বলব যে রেল-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত মালিকানায় দিয়ে দিলে এরকম হবে না...রেল কর্তৃপক্ষই এই বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য দায়ী...।'

সারা দিনে ত্রিশ ইউয়ান রোজগার হয়েছে দিং-এর। দিং তার মান্ধাতার

আমলের সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছে। অনেকটা পথ। ট্র্যাফিকের আলো সবুজ হতে সে চলতে শুরু করে। গলায় জড়ানো রয়েছে গিঁট বাঁধা নাইলনের দড়ি। রাস্তায় সে বাজার থেকে সবজি কিনে নেবে। পাশ দিয়ে তাকে টপকে চলে যায় বুইক, ক্রাইসলার, টয়োটা, ডজ, জেলারেল মোটরস্-সাংহাই। বিশ্বের নানা পণ্যের ঝকমারি দোকানের আলোতে দেখা যায় দিং ফিরছে তার সাইকেলে। তেষট্টি বছর বয়স। এক হাতে ধরে আছে সাইকেলের হ্যান্ডেল।

pathagar.net

সাংহাইতে এক সন্ধ্যা

আজকাল বড়ো বেশি ভুলে যাই। নিজেকে মনে হয় থেমে যাওয়া ঘড়ি। অকেজো নয়। দম পড়ে না বা ব্যাটারি পালটানো হয় না বলে থেমে আছে। কিন্তু ধাক্কা লাগলে বা ঝাঁকুনিতে সে রকম বোবা ঘড়িও একটু সময়ের জন্য চলে উঠতে পারে। সেকেন্ডের কাঁটাটা হয়তো ঘুমের মধ্যে যারা হেঁটে বেড়ায় তাদের মতোই কয়েক ঘর চলে গেল। সেরকমই হয়েছিল গতবছর, সাংহাইতে। এক দশকেরও বেশি সময় পরে। আমার সঙ্গে একটা লোকের দেখা হয়ে গিয়েছিল।

ব্যাংকক থেকে আমি তার আগের দিন বিকেলে সাংহাইতে এসেছিলাম। তখন একটা টাইফুন সাংহাইতে আছড়াচ্ছে। আকাশে বৃষ্টির ফায়ারিং স্কোয়াড। চায়না এয়ার-এর বোয়িংটা খুব ভালোভাবে নামেনি। ভালো ল্যান্ডিং-এ অত জোরে চাকার সঙ্গে জমির ধাক্কা লাগে না। রাফ—যাকে বলে। সঙ্গে একদল জাপানি ট্যুরিস্ট ছিল। তারা সবাই মিলে হাততালি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, ফাঁড়াটা কেটে গেছে। আমি উঠেছিলাম পাইন সিটি হোটেলে। এর আগেও আমি বার ছয়েক সাংহাইতে এসেছি। আমার অচেনা শহর নয়। ঝাও জিয়া বাং রোডের ওপর উনিশ তলা হোটেলটা দেখতে উলটো করে রাখা একপাটি বাঁধানো দাঁতের মতো। আমি ছিলাম আঠেরো তলায়। ঘোলা রাতের আকাশ আমার সামনে, মানে জানলায় একনাগাড়ে বৃষ্টির ধাক্কা। তার মধ্যে দিয়েই দেখা যায় আকাশে আলো ছড়াতে চেষ্টা করছে ওরিয়েন্টাল পার্ল টি. ভি. টাওয়ার। পরদিন সকালে 'সাংহাই ডেইলি'-তে পড়েছিলাম ৬ জন ঠিকে-শ্রমিক ওই টাইফুনের মধ্যে দেওয়াল চাপা পড়ে মারা গেছে। এখনকার চীন অর্থাৎ গোলোকায়িত চীনের এটা দৈনন্দিন ঘটনা। হয় কয়লা খনিতে ধ্বস নেমে বা কারখানায় আগুন লেগে মানুষ মরছে। বেঘোরে। পর পর স্কাই স্ক্র্যাপার। লেটেস্ট মডেলের গাড়ি। সারা দুনিয়ার সেরা সব ব্র্যান্ড নেমের বিলাসদ্রব্যের বিজ্ঞাপনের সমুদ্র। বিশ্বের কোনো দেশে এত সেলফোন ব্যবহার হয় না। ঘুম আসছিল না।

BanglaBook.org

ভাবছিলাম, কলকাতায় গলির মধ্যে দোতলায় একটা ছোট্ট ঘরে এখন কেউ নেই। ধুলো জমছে। মোড়ের যে ছোট্ট চীনে হোটেলটা থেকে আমার রাতের খাবার আসে সেই হোটেলের মালিক ও তার বউ, ওরা জানে না যে আমি ওদের দেশেই এসেছি। জানবেও না কারণ আমি বলব না। হয়তো কয়েকমাস পরে আমি কলকাতায় ফিরব। যদি সত্যিই উলটোপালটা কিছু না ঘটে তাহলে ফিরতে হবেই। ফের সেই ক্লান্তিকর অপেক্ষা। আজেবাজে কাজের অফার। বিপদে পড়ে যাওয়া কোনো বন্ধুর এস. ও. এস। নয়তো সেই রাত করে বেশি মদ খেয়ে ট্যাক্সি থেকে নামা ও টলতে টলতে গিয়ে চীনে বউটাকে বলা যে রাতে খাব না। ও সেই গালাগালি করবে। ছোট্ট নেপালি ছেলেটাকে বলবে আমাকে এগিয়ে দিতে। ও বোঝা না আমার নেশাটা অন্ধকারে থাকে না। কারণ অন্ধকার মানেই অনেক কিছু ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাই অজানা কোনো সুইচ যেন আমাকে সজাগ করে দেয়। এগুলো অবশ্য কারও জানার বা বোঝার কথা নয়। সংখ্যায় অনেক না হলেও দুনিয়াতে আমার মতো কয়েকজন মানুষ রয়েছে। সব অকেজো ঘড়ি। বাতিল। এরপর শুরু হয় নেশাচ্ছন্ন ঘুম ও চোখের পাতা না থাকা স্বপ্নদের প্রজাপতিদের খেলা। প্যাট্রিস লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অলিন্দে রোহন বিজয়বীর। বুলগেরিয়ান সিগারেটের প্যাকেট। জাকার্তায় রাত্রের অটো। বেইরুটে কোনো ঘরের মধ্যে বসে বাইরে ইজরায়েলি উজি। সাব-মেশিনগানের শব্দ। ভাঙা ক্যাসেট প্লেয়ারে বাজতে বাজতে ব্রায়ান ইনো-র সংগীত কখন বন্ধ হয়ে গেছে। সাংহাইতে প্রথম রাত্তিরটা আমি মদ খাইনি। ডিনার খেয়েছিলাম। জানলে চীনে বউটার ভালো লাগত। ভালো লাগত ধুলো পড়া কাচের ওপরে দাঁড় করানো ততোধিক ধুলো পড়া একটা ছবির যাতে একটি মেয়ে তার বাচ্চাকে নিয়ে তাজমহলের সামনে বসে। এখানেই বসে ছবি তুলেছিল সস্ত্রীক পুতিন। এর মধ্যে কোনটা ইতিহাস আর কোনটা তামাশা সেটা বোঝার মতো মার্কস আমার পড়া নেই। হোটেলের ঘরের টিভিটা জাপানি। তোশিবা। সি. সি. টি. ভি.-র অসংখ্য চ্যানেল। এছাড়া রয়েছে রয়টার্স, স্টার মুভিজ। বিশ্বকাপ ফুটবল। রিপ্লে না তখনই খেলাটা হচ্ছে? কারা খেলছে? ঘুমিয়ে পড়ার মুখে মনে পড়ে কালকেও তানানানা করে দিনটা আমার কাটাতে হবে। পরশু দেখা হবে। ১৯৮০ সালে আন্দ্রেই সাখারভ ব্রেজনেভকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন—'The ruinous super-militatarization of the country is getting worse (it is

especially destructive in conditions of economic difficulty), vitally important reforms in the consumer economy and social spheres are not coming into being ...' ব্রেজনেভ চিঠিটা না পড়েই আন্দ্রোপভকে দিয়ে দেয়। চীন কি তাহলে ঠিকই করছে? গত বছর, সাংহাই-তে, এইসব কথা ভাবতে ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

পরদিন, স্রেফ স্মৃতির সঙ্গে খেলা করার জন্যে আমি 'বান্ড'-এ বেড়াতে গিয়েছিলাম। হুয়াংপু নদীর ধার দিয়ে বাঁধানো এক টানা বেড়াবার জায়গা হলো 'বান্ড্'। দার্জিলিং-এর ম্যাল যেমন, যেমন দিল্লির কনট্‌প্লেস তেমনই হলো 'বান্ড'। কিউবার অসমসাহসী ছেলে সান্তিয়াগো আর তার রুমানিয়ান স্ত্রীর সঙ্গে ওখানে আমরা অনেক বেড়িয়েছি, আইসক্রিম খেয়েছি, ছবি তুলেছি। সান্তিয়াগোর সঙ্গে আমার আর কখনো, কোথাও দেখা হবে না। পেরুতে ও মারা যায়, একটি গেরিলা প্লেটুনের সঙ্গে। খবরটা আমার কাছে এসেছিল;ঘটনাটা ঘটার সাত মাস পরে। একজন অ্যামেরিকান সাংবাদিক আমায় খবরটা দিয়েছিল। অবশ্য খবরটা দেওয়ার জন্যে নয়। বরং এটা প্রমাণ করার জন্যে যে কিউবানরা তাদের আগের রাস্তা ছাড়েনি—যে রাস্তায় এখনও হাঁটছে চে গুয়েভেরা। বলিভিয়ায়। আমি যে দেশে যাই সচরাচর সে দেশেরই সিগারেট খাই। সোভিয়েত ইউনিয়নে এটা পারিনি। 'বান্ড্'-এ দাঁড়িয়ে, টাইফুন কমে আসার পরের ঢেউ দেখতে দেখতে, চীনের সিগারেট 'হংতাশান' খেতে খেতে, আমার নজরে পড়েছিল উসকোখুসকো লাল চুল, জেমস্‌ জয়েসের মতো প্যাঁশনে পরা একটা লোক, চীনের কোটি কোটি মানুষের মতো হাফ রেনকোট পরা (এটা পরলে সাইকেল চালাতে সুবিধে হয়), তলায় জিনস, পায়ে অ্যামেরিকান স্নিকার্স—কমিকাল একটা মানুষ টালমাটাল বাতাসে তাল ঠিক করতে করতে ১ ইউয়ান দিয়ে কেনা চীনে লাইটার জ্বালতে পারছে না। হোটেলে দেশলাই থাকে। হোটেলের নাম লেখা। তারই একটা সঙ্গে ছিল। জ্বেলে, আগুনটাকে আড়ালে জ্বালিয়ে রেখে, আমি বললাম,

— নেভস্কি প্রসপেক্তেও একই ব্যাপারটা হয়েছিল।

— অ্যাঁ;

— হ্যাঁ। লাইটারটা ঠিকই আছে। তোমার আঙুলগুলো বেশি কাঁপছে। অ্যালকোহলিক ট্রেমর। আরও বেড়েছে।

— তুমি!

— হ্যাঁ। ইন্ডিয়ান ইয়োগি।

— তুমি?

pathagar.net

— কেন? তুমি কী ভেবেছিলে? ভূত? ওসব আমরা মানিটানি, বল, সাংহাইতে কী করছ? পোস্ট সোভিয়েত স্পাই? এফ.এস.সি-তে জয়েন করেছ?

আগুনটা তখনও জ্বলছে কাঠিতে। শেষের দিকে। গ্রেগর সিগারেট ধরায়।

— এক যুগ পরে।

— যদি দশক ধর তাহলে দশ প্লাস এক, এগারো বছর। তুমি খুব একটা পালটাওনি।

— তাই?

— হ্যাঁ।

এরপর গ্রেগর বলেছিল, না বললেই বরং অবাক হতাম, আমাদের দুই পুরোনো পাপীর মধ্যে দেখা হয়ে যাওয়াটা সেলিব্রেট করতে হবে। আমি বলেছিলাম যে ভদকা নেই, কিন্তু হোটেলে আমার ঘরে একটা স্কচ্ আছে। ভালো। টিচার্স। আমরা ঝোড়ো ভিজে ভিজে হাওয়ার মধ্যে ট্যাক্সি ধরেছিলাম। ড্রাইভারকে হোটেল আর রাস্তার নাম বলতে এক গাল হাসি।

...

কেনটাকি ফ্রায়েড চিকেনের বিশাল হোর্ডিং-এর সামনে ট্যাক্সিটা ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে যায়। ট্যাক্সির ডানদিকে সাইকেলের মিছিল। একটা মেয়েকে তো রীতিমতো সুন্দরী বলে মনে হলো। গ্রেগর বাইরের দিকে তাকিয়ে দোকানের আলো দেখছে।

pathagar.net

— তানিয়া কোথায়?

— আছে, মস্কোতেই।

— তোমরা একসঙ্গে নেই?

— সাত বছর হয়ে গেল। আবার বিয়ে করেছি। এও জার্নালিস্ট। ইতার-তাস-এ।

— ছেলে?

— তানিয়ার সঙ্গে থাকে।

— দেখা হয়?

— যাই মাঝে মাঝে।

— এখন তো ইয়ংম্যান!

— হ্যাঁ। নতুন জেনারেশনের ইয়ংম্যান। আমাদের সঙ্গে মেলে না।

ট্যাক্সিটা ফ্লাইওভারে উঠছে। বেশিরভাগ গাড়ির মডেলই অ্যামেরিকান-ক্রাইসলার, বুইক, সাংহাই জি. এম। ত্যারচা হয়ে পড়ছে ওপরের আলোগুলো। ড্রাইভার এফ. এম. চালিয়েছে। স্পাইস গার্লদের স্টুপিড গান। গ্রেগর চুপ করে আছে। আমিও কয়েক লহমার জন্যে চোখ বন্ধ করি। একটু ঝিমুনি কি এসেছিল? সাংহাই মিউজিয়ামে দেখা একই আসনের ওপরে ব্রোঞ্জের তিন অমিতাভ। সুই আমলের। ৫৮১-৬১৮ খ্রিস্টাব্দ। সান্তিয়াগোর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সব দেখেছিলাম। চোখ খুলি। হোটেলের কাছে এসে পড়েছি। কিয়স্ক, ভিডিও অডিও সি ডির দোকান। এবারে ট্যাক্সিটা ডানদিকে মোড় নেবে। একটু অস্বস্তি লাগে ভাবতে যে ব্রোঞ্জের তৈরি ওই তিনজন অমিতাভর সঙ্গে আর কখনো আমার দেখা হবে না।

...

আমি খুব লো ভল্যুমে চ্যানেল মিউজিক চালিয়ে দিয়েছিলাম।

— এই, হুইস্কিতে মিনারেল ওয়াটার মিশিও না।

— পাগল! ভালো হুইস্কিটাকে খুন করার কোনো মানে হয়?

— তুমি কী করছ এখন?

একটা কার্ড এগিয়ে দিই। এক পিঠে স্প্যানিশ। অন্য পিঠে ইংরেজি। গ্রেগর দুটোই জানে। ও কার্ডটা ফেরত দেয়। আমি বলতে থাকি।

— ভেনেজুয়েলার অয়েল এক্সপার্টদের একটা টিম এই বছরেই চীনে আসবে। সেই ব্যাপারেই এসেছি। ওদের আনছে 'সিনোপেক' সাংহাই পেট্রো-কেমিকালস। এবারে বল, তুমি কী করছ?

— কী আবার! যা করতাম সেটাই বলা চলে। রিয়া নোভস্তিতে আছি।

— রাজনীতি?

— পুরোনো অভ্যেস। রুশ কমিউনিস্ট পার্টিতে আছি। যদিও জিউগানভদের দিয়ে কিছু হবে বলে মনে হয় না।

— হার্ডলাইনারদেরও তো একট পার্টি আছে।

— আছে। পুরোনো একটা জেনারেশনের লোক যতদিন আছে থাকবে। তারপর থাকবে না। আমার ব্যাপারটা হলো স্রেফ নামকাওয়াস্তে থাকা। সত্যি বলতে কিছুই করি না।

মোরোজভ কোথায় জান?

pathagar.net

— নেপালে ছিল। ওখানে যখন রয়্যাল ফ্যামিলি ম্যাসাকার হলো তখন গিয়েছিলাম। দেখা হয়েছিল।

— আমিও শুনেছিলাম ও নাকি এমব্যাসিতে ছিল।

— খোঁজ নিয়ে দেখলে এখন হয়তো লাইবেরিয়া বা বুরকিনা ফাসো, কোথাও একটা পাওয়া যাবে।

— আমার কিন্তু লোকটার ওপরে একটা সফট্ কর্নার রয়ে গেছে। ব্রেজনেভের আমলটা যে পচে যাচ্ছিল সেটা ও তখনই বুঝতে পেরেছিল।

— তুমি ভলকোগনভের বইটা পড়েছ?

— পড়েছি। অবশ্য ব্রেজনেভকেই বা একতরফা দোষ দেব কী করে। এক পাতাও না লিখে একটা লোক সাহিত্যের লেনিন প্রাইজ পেয়ে যায়। অথচ একাট প্রতিবাদও হয় না।

— হয়েছিল। পরে। গোরবাচভের আমলে। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তোমার প্রোনিনকে মনে আছে?

— একবার দেখা হয়েছিল। লেনিনগ্রাদে।

— সুইসাইড করে। তাও পাঁচ বছর ধর হয়ে গেল। ডিপ্রেশনে ভুগছিল।

— ওলেগ তরচিনস্কিও সুইসাইড করে। স্টকহোলমে। এরকম কত সুইসাইড হয়েছে একটা হিসেব দিতে পার?

— না। আমাদের নিয়ে কেউ আর এখন মাথা ঘামায় না।

— সেই ভালো। অন্তত এখন তাই মনে হচ্ছে। তোমার কখনো সুইসাইড করার কথা মনে হয়নি?

— না।

এই 'না'-টা আমি শুনতে চেয়েছিলাম। মালয়েশিয়ার উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলে আজিজ, যে এখন ড্রাগ মাফিয়ার হয়ে বেধড়ক খুনজখম করে ইন্টারপোলের মাথা ধরিয়ে দিয়েছে, সে আমাকে মিথ্যে কথা বলেনি। প্রোনিন বা ওলেগ যে কারণে সুইসাইড করেছে সেই কারণগুলো গ্রেগরদের বেলায় খাটে না। জাহাজ যখন ডোবে তখন ইঁদুররা যা করে গ্রেগরও তাই করেছিল। গ্রেগরের জন্যে অনেকের জীবন বরবাদ হয়ে যায়। ওই দিকের নেটওয়ার্কের অনেকটা ও এক্সপোজ করে দেয়। ডামাডোলের মধ্যেই খবরটা আমি পেয়েছিলাম। আজিজই আমাকে খবরটা দিয়েছিল। কলকাতায়, শেষবার যখন এসেছিল।

— ফর ওল্ড টাইমস্ সেক...

আরও হুইস্কি ঢালা হয়। অ্যালকোহল পড়েছে বলে সিগারেট ধরাবার সময় গ্রেগরের হাত আর কাঁপছে না। এক ইউয়ান দামের চীনা লাইটার জ্বলে উঠছে। জ্বলে উঠে ধরিয়ে দিচ্ছে গ্রেগরের ঠোঁটে ধরা অ্যামেরিকান সিগারেট। উইনস্টন। হুইস্কির মৌজে গ্রেগর এখন আচ্ছন্ন। সিগারেটের ধোঁয়ায় অস্পষ্ট। বিশ্বাসঘাতকরা এভাবেই ধোঁয়ায় নিজেদের ঢেকে রাখে। যাদের তুমি নামগুলো বলে দিয়েছিলে তারা আবার তাদের হিসেবের ঠিক লোকেদের নামগুলো জানিয়ে দিয়েছিল। এটা ঠিক যে, গ্রেগর যাদের ঘাতকদের হাতে তুলে দিয়েছিল তাদের আমি চিনি না। কিন্তু ওই ঘাতকদের আমি চিনি। চিনতে আমাকে হয়েছে। জীবন, একটা শতাব্দী ধরে অনেক স্বপ্ন অনেকের দেখার যে জীবন, সেই জীবনেই কোনো না কোনো ভাবে জড়িয়ে পড়ার ফলেই ওদের চিনেছি আমি। ইন্দোনেশিয়ার কোনো প্রৌঢ় ফটোগ্রাফার। ডার্ক রুমে পড়ে আছে। একজন চুলের মুঠি ধরেছিল। আর একজন 'পারাং' দিয়ে কেটে দিয়েছিল গলা। হয়তো কোনো গ্যারেজ মেকানিক। বা এয়ারপোর্টের কোনো ক্লোক রুম ক্লার্ক। সাইলেন্সার লাগানো রিভলভারের ভারী, অসাড় একটা শব্দ। গ্রেগর ডিপ্রেশান নেই। গ্রেগরদের ডিপ্রেশান হয় না।

— কদিন থাকবে তুমি সাংহাইতে?

— আমি! কালই চলে যাচ্ছি। জাকার্তা। হয়তো ইন্দোনেশিয়া মাথায় ঘুরছিল বলেই জাকার্তা বলেছিলাম। আমি কী করতে জাকার্তায় যাব?

— তুমি?

— আমায় থাকতে হবে। মোটের ওপর চারটে ইকনমিক জোনে সাংহাইকে ভাগ করা হয়েছে—পুদাং, কাওহেজিং, হংকিয়াও আর হংকিয়াও আর মিনহ্যাং। এর ওপরে একটা লেখার জন্যে এসেছি। কাল থেকেই ঘোরাঘুরি শুরু।

ভেনেজুয়েলার যে কার্ডটা আমি গ্রেগরকে দেখিয়েছিলাম সেটার বদলে অন্য কোনো কার্ডও আমি দেখাতে পারতাম। যেমন ধরা যাক সুইডেনের একটা ছোটোখাটো মাল্টিন্যাশনালের কার্ড যারা পেপার মিল বানায়। এটা ঠিক যে কালই আমি চলে যাব। কিন্তু সবকিছুই নির্ভর করছে কয়েকটা টেলিফোনের ওপর। গ্রেগর এবার যাবে। গ্রেগরি আস্তাফিয়েভ। আমার বন্ধু।

— একটা কথা বলব?

— বলো।

— আমার কাছে মদ নেই। বাকি হুইস্কিটা নেব?

— অবশ্যই। আরে তোমার সঙ্গে দেখা হলো বলেই তো বোতলটা

pathagar.net

খুললাম। তোমার জিনস-এর পকেটে ঢুকবে?

— ঠিক ঢুকবে।

— বোতলটা কিছুটা বেরিয়ে থাকে।

— তোমায় দেখে কী মনে হচ্ছে জান!

— কী?

— মলোটভ ককটেল পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ!

লিফ্‌টে ১৪-র পরেই ১২—অপয়া ১৩ নম্বর কোনো তলা নেই। লিফটেই গ্রেগর বলেছিল,

— লেনিনের একটা কথা হঠাৎ মনে এল। যদি খুব ভুল না করি ক্লারা জেটকিনকে বলেছিলেন, অনেকটা এইরকম—পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবের প্রথম জলোচ্ছ্বাস সরে গেছে, দ্বিতীয়টি এখনও ওঠেনি...তোমার কী মনে হয়...আমরা কি ওই দ্বিতীয় জলোচ্ছ্বাসের জন্য অপেক্ষা করছি?

হেসে ফেলি।

— জানি না।

লিফট তলায় পৌঁছয়। আমি গ্রেগরকে এগিয়ে দিই। সামনেই ট্যাক্সি ছিল। বৃষ্টি নেই। গ্রেগরকে হাত নাড়ি। ট্যাক্সি চলে যায়। হোটেলের সামনের রাস্তাটা বড়ো সুন্দর। রক গার্ডেন। পপলার গাছ। হাঁটতে ইচ্ছে করে। একটা সিগারেট ধরাই। মনে মনে গ্রেগরকে বলি,

— ওর দ্বিতীয় জলোচ্ছ্বাসটা যদি সত্যিই আসে তাতে কিন্তু গ্রেগর, তুমি ও তোমার মতো অনেকে বেসামাল হয়ে হাবুডুবু খেতে খেতে তলিয়ে যাবে। আর কিছু একটা সামান্য কোনো কিছু যদি তখন আঁকড়ে ধরতে চাও, আমি যদি সেখানে থাকি, তাহলে সেটা আমি সরিয়ে নেব। আমার হাত কাঁপবে না।

৯৮৬৪৪

আমি ভাবছিলাম। ভাবছিলাম যে আচমকা যদি এখানে উর্দিপরা বদমাইশ-গুলো আমাকে তুলে নিয়ে যায় এবং জেরা করতে শুরু করে তাহলে কী সহজেই আমি একের পর এক জবাবগুলো দিয়ে যাব। সত্যি বলতে সার্চ করলে আমার কাছে কিছুই পাওয়া যাবে না। ফাইলের মধ্যে যে ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইংগুলো রয়েছে সেটা যে সুহার্তো বা তার কোনো দোসরের বাড়ির নক্সা নয় তা বুঝতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই। আমার পাসপোর্ট ভারতীয়। আপাতত সুইডেনের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়-শহর উপসালা থেকে এসেছি। সেলপাপ কর্পোরেশন একটি ছোটো মাল্টি ন্যাশনাল। সুইডিশ। তাদের হয়েই ইন্দোনেশিয়ান সরকারের একটি টেন্ডারের ব্যাপারে। অ্যামেরিকানরা তো আছেই। ফিনল্যান্ডও আছে। সবটাই পাতি একটা ব্যাপার। রুটিন। এরকমই চলছে দুনিয়ায় সর্বত্র। মন্টেভিডিও থেকে মস্কো। বুয়েনস আইরেস থেকে কামপালা। এরকম হওয়াটাই নিয়ম। তারমধ্যে হাঠৎ কতগুলো ইউনিফর্ম পরা প্যারামিলিটারি উল্লুক আমাকে তুলে নিয়ে যাবে কেন?

আমার জাকার্তায় এলেই কেমন যেন গা গুলোতে থাকে। অথচ ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখলে শহরটা কি মারাত্মক অন্যরকম? কুয়ালালামপুর বা ব্যাঙ্কক থেকে অনেকটাই কি আলাদা? তাহলে! সত্যি বলতে জাকার্তায় আমার আসতে ইচ্ছে করে না। সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনে বেশি মদ খাওয়া হয়ে যায়। উলটোপালটা খরচ হয়ে যায়। এবারে যেমন কিনেছি একটা লাৎভিয়ার গ্লাস ক্রিস্টালের মালা। এটা পাবে আর পেয়ে খুব খুশি হবে কলকাতার একটি ছোট্ট চীনে হোটেলের চীনে-মালিকের বউ। ওর বরের জন্য কিনেছি একটা ডিজিটাল ডায়েরি যার মধ্যে এফ. এম. রেডিও রয়েছে। যে নেপালি ছেলেটা রাতে আমার ঘরে খাবার দিয়ে যায় তার জন্য একটা ঘড়ি যা তিনটে শহরের টাইম দেখায়। ক্বচিৎ কখনো নেপালি ছেলেটা যদি খাবার নিয়ে ফিরে গিয়ে খবর দেয় যে এত মদ খেয়ে ঘুমোচ্ছে যে রাতে খাবে না, তাহলে পরদিন আমাকে চীনে মহিলার কাছে প্রভূত

pathagar.net

গালাগালি শুনতে হয়। আমি চুপ করে শুনে যাই। ওর বর ফোনে অর্ডার নেয় আর আমার দিকে তাকিয়ে মিচমিচ করে হাসে। কলকাতা সবচেয়ে ভালো। আমার ছোট্ট ধুলো কিচকিচে ঘর। আমার যে কোনো পোশাকে ঘুমোবার দলামোচড়ানো বিছানা। টয়লেটে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার শব্দ। প্রায় অকেজো ক্যাসেট-রেকর্ডারে ব্রায়ান ইনো বা মাইলস ডেভিস। কলকাতার শব্দ, ট্যাক্সির মিটারের শব্দ, ড্রেনের মধ্যে থেকে পরির ওড়নার বেরিয়ে এসে ভেসে যাওয়ার আলোরা...একটা লোক পুড়ে মরছে...তার গলায় একটা জ্বলন্ত টায়ার...এর একটা নামও রয়েছে....নেকলেস...ওফ্...বেশি মদ খাওয়া হয়ে যায় জাকার্তায় এলে। কেন যে আসা হয়ে যায় জাকার্তায়! ঝিমটা কেটে গেল।

আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে ওরা একটা ফটোগ্রাফ এগিয়ে দিল। ছোটো ছবির থেকে এনলার্জ করা। এই রাস্তাগুলো যে বেইরুটের সেটা চারপাশটা দেখলে বুঝতে অসুবিধে হয়। চেক্‌দের বানানো একটা ট্যাট্রা ট্রাকে ড্রাইভারের পাশে সানগ্লাস পরা এ লোকটা কে? ট্রাকের ওপরে যারা, তাদের দ্রুজ্ গেরিলা বলেই তো দুনিয়া চেনে। ইজরায়েলিরা সেইদিনই বেইরুট থেকে সরে যাচ্ছিল। ছবিটা যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। নয়? ঠিক আছে। হিজবুল্লাহ্-রা রুট মার্চ করছে রাস্তায়। জনৈকা মহিলার পাশে দাঁড়িয়ে প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে সেটা দেখছে যে তার সঙ্গে আপনার মিল নেই বলতে চান? ছবিটা আরও ম্যাগনিফাই করাই যায়। সিগারেট প্যাকেটটা বুলগেরিয়ান। চটকাটা কেটে যেতে ওয়েটারকে বললাম আর একটা হুইস্কি। স্টিফ। বলেইছি জাকার্তায় এলেই আমার মদ খাওয়াটা বেড়ে যায়। কেন এরকম হয়? জেগে উঠতে যাদের শুধুই ক্লান্তি আর ঘুমিয়ে থাকতেও বিরক্তিকর লাগে তাদের জন্য একটা ছোট্টো দ্বীপ বা ওরকম কোনো জায়গা বরাদ্দ করা যায় না? ভালো লাগে না। একেবারেই ভালো লাগে না। যেমন ভালো লাগে না জাকার্তায় আসতে। জঘন্য হলেও এর চেয়ে ম্যানিলা ভালো। মেক্সিকো সিটি ভালো যেখানে চব্বিশ ঘণ্টা ট্র্যাফিক জ্যামের ক্লান্তি কেটে যায় রাস্তার জাগলারদের মুখ দিয়ে পেট্রোল মশাল জ্বালার খেলা দেখে। ঠিক এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতে পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে খেলা করছিলাম। ওরা যদি আমার কাছে জানতে চায় যে 'মস্কোভিচ' গাড়ির চাবি এখানে কী করে এল? 'লাডা' হলেও কথা ছিল। চাবির রিংটা পকেটে রাখলাম। বরফ দেওয়া হুইস্কির গ্লাসে ওয়াইপারের মতোই কাচ স্পষ্ট করে দিয়েছে আমার আঙুল। কিন্তু সেখানে ও হাতের তেলোতেও কী

একটু ঘাম ছিল না? দুটো টেবিল পরে একজন অ্যামেরিকান 'ফার ইস্টার্ন-ইকনমিক রিভিউ' পড়ছে। পড়তেই পারে। ওই ইস্যুটাতেই আমাদের কোম্পানির একটা প্রোফাইল রয়েছে। আমি কে? সেলপাপ কর্পোরেশনের জনৈক ভারতীয় এক্সিকিউটিভ? নাকি অন্য কেউ? যে এখন জাকার্তায় হোটেল গরুড় ইন্টারন্যাশনালে বসে একটার পর একটা স্কচ খাচ্ছে? ডেভিড ডইচাস-এর ওই অনবদ্য বইটার কী নাম যার বিষয় ছিল স্কচ হুইকি?

দুজন আধবুড়ো ইন্দোনেশিয়ান এসে দূরে বসল। আমি বরং এই স্মৃতি-নির্ভর মারাত্মক রক্তাক্ত খেলায় ওদের নাম দিলাম কমরেড আইদিৎ ও কমরেড সুদিসমান। আপনারা কি বুঝতে পেরেছিলেন যে ইন্দোনেশিয়াতে যা ঘটছিল তা অন্য চেহারাতে হলেও সারা বিশ্বে ঘটতে চলেছে? কমরেড ফিলবি, আপনি একটু আপনার ওই হাইপাওয়ার শর্টওয়েভ রেডিওতে ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেটের স্টুপিড কমেন্টারি বন্ধ করবেন? আপনি বা মাতাল ম্যাকলিন ও মাতাল বার্জেস এ নিয়ে আলোচনা করেননি? ইন্দোনেশিয়াতে কম করে হলেও ৫০০০০০ কমিউনিস্টকে খুন করা হয়। ৭০০০০০ কেউ বলে। কারও মতে ১০০০০০০-এরও বেশি। কমিউনিস্টদের মৃতদেহ জমে জমে নদীনালাগুলো আটকে গিয়েছিল। 'পারাং'—একরকমের দেশি কুঠার। কমিউনিস্টদের কান বস্তা করে জমা পড়ত পুরস্কারের লোভে। সারা দুনিয়ার গণতন্ত্রপ্রেমী খানকির ছেলেগুলো মুখে লুপ লাগিয়ে বসেছিল। প্রেসিডেন্ট সুহার্তো নামক 'জননীর গর্ভের লজ্জা'টি নিজের দেশে ছিল তৎকালীন পশ্চিম জার্মান 'ফোকসওয়াগন'-এর এজেন্ট। জাপানের জাইবাৎসু-র (দুনিয়া যাঁকে 'মিৎসুবিশি' নামে চেনে) এজেন্ট ছিল আর্মির এক জেনারেল। সোকার্নোর 'নাসাকম' কর্মসূচির ভূমি সংস্কার বাতিল হলো। ৬৫-তে কমিউনিস্ট নিধনের পর ৬৭-তে চালু হলো ফরেইন ইনভেস্টমেন্টস। শুরু হলো কিকব্যাক, ঘুষ ও ফ্রাঞ্চাইসি বিতরণের খেলা। কমরেড আইদিৎ, একটি দেশে বিপ্লব যদি সম্ভব হয় তাহলে একটি দেশে গোলকায়ন অসম্ভব হতে যাবে কেন? জানি, আপনি বলবেন যে আমার মাথায় ট্রটস্কি চেপে বসে আছেন, বলে আপনি আলতো করে হাসবেন। এরপরেই যেটা ঘটল সেটাকে স্পেকটর বা ভূত, কী বলব? গ্লাসগো ডকইয়ার্ডের ট্রটস্কাইট সোশ্যালিট ওয়াটারফ্রন্ট ওয়ার্কাস ইউনিয়নের জঙ্গি কর্মী লিলিয়ান এখানে কী করছে?

লিলিয়ান বেশ উশকোখুশকো, কাঁধে ট্র্যাভেলিং ব্যাগ, জিনস আর স্পোর্টস শার্ট পরা, ক্লান্ত। উদ্‌ভ্রান্তও বলা চলে। সঙ্গের পুরুষটি একেবারেই পাতি

এমব্যাসির মাল। ব্রিটিশ ছোঁড়ারা যখন ওভারসিজ কাজ পেয়ে বেরোয় তখন এরকম লালু লালু ক্যাবলাই থাকে। পরে তৈরি হয়ে যায়। ছেলেটা দেখলাম রুম বুক করাল। কোনো কারণে লিলিয়ান এখন এমব্যাসির দায়িত্বে। লিলিয়ান এগিয়ে গিয়ে লিফটে যাওয়া অব্দি ছেলেটা দাঁড়িয়ে থাকল। আমি বাইরে এসে ছেলেটার ফেরার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। হ্যাঁ, ওর গাড়িটা এমব্যাসিরই। সিগারেট ধরালাম। লিলিয়ান জাকার্তায়। কেন? সবটাই কি ভুল দেখলাম? তেমন তো হওয়ার কথা নয়। এডিনবরায় ট্রটস্কাইটদের একটা কালচারাল ফেয়ারে আমার সঙ্গে লিলিয়ানের আলাপ। ওর বাবা স্পেনে লড়তে গিয়ে মারা যায়। ওর সঙ্গে বেশি আলাপ জমার কারণ অন্য। জানা গিয়েছিল যে, আমরা দুজনেই আরসেনালের ফ্যান। সেটাই বন্ধুত্বটা বাড়িয়ে দেয়। আর কেউ রুম বুক করছিল—জাপানিই সম্ভবত। আমি সেই সময় কনডাকটেড ট্যুরের খুঁটিনাটি জানবার জন্য রিসেপশনিস্ট মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছিলাম। লিলিয়ানের রুম ৫৩১, আর আমার ৬১৪। আমাকে নেমে ওর দরজায় নক করতে হবে। আমি লিফটে ওর ফ্লোরে যাব না। ভুল করে '৭'-এ গিয়ে আমি '৬'-তে হেঁটে নামতে পারি। কোনো অসুবিধে নেই। এতবার এগুলো করতে হয়েছে যে আর ভালো লাগে না। লিলিয়ানের ট্র্যাভেলিং ব্যাগে লেখা ছিল 'আকাই'। জাপানি কোম্পানি। 'আকাই' মানে লাল। 'আকাহাতা' মানে রেড ফ্ল্যাগ। জাপানি কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক সংবাদপত্র। পাঁচ, ছটা কনডাকটেড ট্যুর আছে। নম্র মেয়েটি জানতে চায় কোনটা আমি নেব। বললাম নেশা হয়ে গেছে। এখন ঠিক করা যাবে না। ইনোসেন্ট মেয়েটিকে কি বলা যায় যে ওই ছাতার মাথা কনডাকটেড ট্যুর নিতে আমার বয়ে গেছে। আমার দরকার ছিল লিলিয়ানের রুম নাম্বারটা জানার।

লিলিয়ান সম্ভবত স্নান করছিল। ফোনে জলের শব্দ ছিল। বাথটাবে জলের শব্দ।

— ইয়েস!

এর উত্তরে আমি হিউ ম্যাকডায়ারমিডের 'ওড টু লেনিন'-এর প্রথম লাইনটা বললাম। নিঃশ্বাসের শব্দ। এবারে নামটা বললাম। রুম নাম্বার। লিলিয়ান প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় চিৎকার করে উঠতে আমি বলেছিলাম উত্তেজিত না হতে। আমি তার ঘরে যাব না সে আসবে? লিলিয়ান বলল আমাকেই আসতে। আমি বললাম দশ মিনিট পরে। এখন আটটা কুড়ি। একই হোটেলের একটা ঘর থেকে আর একটা ঘরে যেতে গেলে ন্যূনতম একটা

প্রস্তুতির দরকার। কারণ ওই ঘর থেকে আমাকে বেরিয়ে অন্য কোথাও যেতে হতে পারে। বা ওখানে থেকেও যেতে পারি। এক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনাটা কম। এরকমও হয়েছে যে আমি আর একটা মরা মানুষ এক ঘরে থেকেছি। আমি নিজের ঘর থেকে যখন তার ঘরে এসেছিলাম সে বেঁচে ছিল। সেই ঘর থেকেই আমি এয়ারপোর্টে চলে গেছি। এক্ষেত্রে সেটাও হতে পারে না। অবশ্য উলটোটা হলেও কিছু এসে যেত না। আমার একটা ধারণা হয়েছে। মৃত্যুকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ওপরে অনেকটা নির্ভর করে।

— লিলিয়ানের দুগালে চুমু খেলাম।

— আমি কেন এখানে এই প্রশ্নটা করলে আমাকে বলতে হবে কাল একটা টেন্ডার প্লেস করার জন্য এসেছি। কালই বিকেলের ফ্লাইটে চলে যাব। টেল অ্যাভিভ। তুমি ডিসটার্বড। জাকার্তায় নতুন। এম্বাসি তোমাকে হেল্প করছে। এবারে বল।

লিলিয়ান যা বলেছিল সেটা জানার আগে আমাদের একটু খেলার জুতোর সবচেয়ে বড়ো কোম্পানিগুলোর নাম জানা দরকার। **অ্যাডিডাস, এলেস, ফিলা, নিউ ব্যালেন্স, নাইকি, পুমা, রিবক ও অ্যামব্রো। ১৯৬০-এর পরে বাজারে এলেও এখন এক নম্বর হচ্ছে 'নাইকি' যাদের বার্ষিক জুতো বিক্রির মোট মূল্য হলো ৯.২ বিলিয়ন ডলার। ৮০ শতাংশ নাইকির জুতো খেলায় ব্যবহৃত হয় না। পরাটাই ফ্যাশন। বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে কনট্র্যাক্ট শ্রমিকরা এইসব জুতোর সিংহভাগ বানায়। ইন্দোনেশিয়াতে 'নাইকি' কোম্পানির শ্রমিকরা পায় দিনে ২.৬০ ডলার।**

'নাইকি'-র চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ফিল নাইট এক বছরে যত টাকা কামান তত টাকা রোজগার করতে হলে একজন এনট্র্যাক্ট শ্রমিককে ৯৮,৬৪৪ বছর ধরে জুতো বানাতে হবে।

৯৮,৬৪৪

ইংল্যান্ডের ফার্স্ট ডিভিশনের ফুটবলার ডেভিড ব্ল্যাক যে কোম্পানিতে কাজ করার জন্য ইন্দোনেশিয়াতে এসেছিল তার নাম দেওয়া যাক 'ইউ. এস'.।

লিলিয়ান আগেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। তারপর যে ঘটনাটা বলল সেটা এইরকম। লিলিয়ানের সঙ্গে বছরখানেক প্রেমের পরে গত বছর ডেভিড ও লিলিয়ানের বিয়ে হয়। ডেভিডের এই বছর প্রিমিয়ার ডিভিশনের কোনো ক্লাবে চলে যাওয়ার কথা ছিল। ডেভিড অ্যাটাকিং হাফ। বোল্টন ওর ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। 'ইউ. এস.' কোম্পানির লোগো পরে খেলতে ডেভিড অস্বীকার করে। টিম থেকে তাকে বাদ পড়তে হয়। ডেভিড লিলিয়ানের কাছে

জেনেছিল যে 'ইউ. এস.' শ্রমিকদের শোষণ করে ও জঘন্যভাবে ঠকায়। তখন ডেভিড ঠিক করে যে খেলা ছেড়ে দিয়ে সে পুরোদস্তুর কোচিং-এ চলে যাবে। কিন্তু মত পালটে সে হাতেনাতে সবকিছু পরখ করার জন্য মাস পাঁচেক আগে ইন্দোনেশিয়াতে চলে আসে এবং কন্ট্র্যাক্ট হিসেবে 'ইউ. এস.' কোম্পানিতে নাম লেখায়। সে দেখে শ্রমিকদের কী কদর্যভাবে বুরবক বানানো হচ্ছে। অনেকদিন নিজেই ডেভিড পেট ভরে খেতে পায়নি। শ্রমিকদের যে সংগঠিত করতে শুরু করে। মজুরি বাড়ানোর দাবিতে এগিয়ে আসতে বেশিরভাগ গরিব শ্রমিকেরই ভয় ছিল। কিন্তু গত মাসে অসম্পূর্ণ হলেও একটা ধর্মঘট হয়। 'ইউ. এস.' কোম্পানির ইন্দোনেশিয় শাখার মালিকানা সুহার্তোর কোনো বশংবদের। সাতদিন আগে ডেভিড নিখোঁজ হয়। লিলিয়ান খবর পেয়েছে একটা জিপ ওকে তুলে নিয়ে যায়। ও আজই এসেছে। ব্রিটিশ এম্বাসি এরমধ্যে রুটিনমাফিক পুলিশ-নির্ভরতা ছাড়া কিছুই দেখায়নি। ডেভিড ব্ল্যাকের মতো গোলমেলে র‍্যাডিক্যালের জন্যে ব্রিটিশরা কূটনৈতিক বা অন্যবিধ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। লিলিয়ান এখন কী করবে?

— তুমি কিছুক্ষণ দয়া করে ফোঁপানিটা বন্ধ কর এবং আমাকে একটু ভাবতে দাও। তোমার সঙ্গে থাকার কথা নয় কিন্তু অ্যালকোহলিক কিছু আছে?

— একটু ব্র্যান্ডি।

— তাই দাও। একটা সিগারেটের চেয়ে বেশি সময় আমি নেব না।

ব্র্যান্ডিটা ভালো। কিছু পাপী আছে যারা ব্র্যান্ডিতে জল মেশায়। খুব ভালো ব্র্যান্ডি খেয়েছিলাম আর্মেনিয়া, জর্জিয়ায়। ৎবিলিসি। স্তালিনের দেশ।

১৯৯৯ সালে 'রিবক-এর মোট বিক্রি ছিল ১.১৯৭ বিলিয়ন ডলার। বার্ষিক মার্কেটিং বাজেট ৪৩৫ মিলিয়ন ডলার। ইন্দোনেশিয়াতে 'নাইকি' শ্রমিকদের খাওয়া পরার মতো মজুরি দিতে হলে 'নাইকি'-র মার্কেটিং খরচের ৪ শতাংশ মাত্র বরাদ্দ করতে হবে। বিলিয়ন মিলিয়নের পাশে সে অঙ্কটা অকিঞ্চিৎকর। ফিলিপাইনস ও চীনে যে ৪০,০০০ শ্রমিক ওইসব জুতো বানায় তারাও বঞ্চনার শিকার।

— শোনো। আমার ধারণা যদি খুব ভুল না হয় তাহলে ডেভিড বেঁচে আছে। ব্রিটিশ সাবজেক্টকে মেরে ফেললে 'ইউ. এস.' কোম্পানির বদনাম। অত কাঁচা কাজ ওরা করবে না। এই রাতটাই আমাদের হাতে, মানে আমার হাতে সময়। তোমাকে আমার সঙ্গে বেরোতে হবে। তারপর যা যা হবে সেটা প্যানিক না করে দেখে যাবে। এখনই আমরা বেরোব।

— একসঙ্গে?

— কেন নয়? ব্রিটিশদের স্টুপিড ভেবো না। ওরাও জানে যে ডেভিড বেঁচে আছে। তা না হলে এত সহজে ভ্যাবলাবাবুকে দিয়ে ওরা তোমায় হোটেল পাঠাত না। এম আই ফাইভ ওয়াচ রাখত। চলো। আমি চাই না ডেভিড অযথা কষ্ট পাক। রাদার আমি চাই না লিটল ট্রটস্কাইট লিলিয়ানের কষ্ট হোক। ও. কে?

ট্যাক্সি ড্রাইভার ছেলেটা বেশ তুখোড়। দু-একটা ভাঙা ভাঙা কথা, কিন্তু আঙুলের সাহায্যে বোঝানো—আমি বলতে চাইছিলাম আমি কী ড্রাগ খুঁজছি। আমি কোনো ছোটো ঠেকে বা লোন পেডলারের কাছে যাব না। গেলে বড়ো হন্টে যাব। চীনেদের এলাকায় যেতে হবে আমায়। 'কার্টেল'—শব্দটা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকাতে সমীহ আদায় করে বইকি!

অনেকটা হলিউডের গ্যাংস্টার ছবিরই মতো। রাস্তা ছেড়ে গলি। অসহ্য জাকার্তার এসব এলাকায় আমি কখনো আসিনি। আসতে চাইও না। ফের গলি। এবারে ট্যাক্সি ঢুকবে না। একটা ইসুজু মিনিট্রাকের সঙ্গে প্রায় ছুঁইয়ে ট্যাক্সিটা রাখতে হলো। এত স্কুটার আর টু-হুইলার যে জায়গা নেই। মোটর সাইকেল থেকে নেমে লম্বা চুল কানে মাকড়িপরা যে ছেলেটা এগিয়ে এল তার সঙ্গে ড্রাইভার কথা বলে চলে গেল। ওকে আমি ভাড়ার বেশি কিছু রুপিয়া আর একটা দশ ডলার দিলাম। খুব বেশি। ছেলেটা আমাদের নিয়ে যেখানে ঢুকল সেটা জেন্টস বিউটি পার্লার। লিলিয়ানের হাত ঘামছে। আমি দুবার আঙুল দিয়ে ওর হাতে টোকা দিয়ে একটু হাসলাম। দরজা খুলল। কাঠের সিঁড়ি। উঠে গেছে। আর একটা দরজা। এটা খুলল একটা ট্রাকের গ্যারেজের দোতলায়। তলায় লোকেরা কাজ করছে। ওয়েল্ডিং-এর ঝলসানো নীল আলো। একটা ট্রাকের বাঁদিকের ইন্ডিকেটারটা জ্বলছে নিভছে। এবারে আর একটা দরজা। সেটা খুলতে অন্ধকার একটা তলায় ফাঁকা, শব্দহীন, কার্পেট পাতা রাস্তা দিয়ে একবার ডানদিকে, ফের ডানদিকে যেতে একটা চিলতে ছাদ। সেখানে কয়েকটা টেবিল ল্যাম্প জ্বালা টেবিল। এককোণে একটা লোক টিভি পর্দায় কম্পিউটার গেম খেলছে। দুজন লম্বা চওড়া সাদা চামড়া। নাবিকই হবে। পরে জেনেছিলাম ওরা ক্যানাডিয়ান। ওদের কোনো দোষ ছিল না। আমি চেয়ার টেনে বসতে বসতে লিলিয়ানকে কাছে টেনে এনে চুমু খেলাম—ওর কানের লতিতে চুমু খেতে খেতে বললাম এরপরে যা যা ঘটবে তখন যেন ও ইংরেজিতে একটাও কথা না বলে। যে লোকটা কম্পিউটার গেম খেলছিল সে উঠে এগিয়ে এল। ক্যামেল-এর প্যাকেট

আর লাইটার রাখতে রাখতে নিচু গলায়, বিশুদ্ধ বাংলায় ওকে বললাম,

— আপনি কি আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু জানেন? লোকটা আর একটু এগিয়ে এল মাথা নিচু করে। এবার হাত দিয়ে যা দেখালাম তার মানে এরোপ্লেন বা মশা যা কিছু হতে পারে। অধিকতর উঁচু স্বরে ও স্পষ্ট উচ্চারণে বললাম,

— আপনি যদি ভেবে থাকেন আমি মুরগি হবার জন্য এসেছি তাহলে গর্হিত ভুল করবেন। ক্যানাডিয়ান দুটোও দেখছিল আমাদের। একটু নেশা হয়েছিল ওদের। আঙুলে সিগারেট হোলডার। এটাই আমার দরকার ছিল। আমি উঠে ওদের দিকে গেলাম।

— কী এমন ঘটল যে আপনারা এত মজা পেলেন? একজন উঠে দাঁড়াল। তার কোনো দোষ ছিল না। আমি খুব জোরেও মারিনি। কিন্তু ও অন্যজনের ওপরে পড়াতে দুজনেই পড়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে ওরা হাত চালাক এটা আমি চাইনি। তাই টেবিলটা ওদের ওপরে উলটে দিলাম। আমার হাতে ফুলদানি। সেটা ঠুকে ভেঙে নিলাম। দেখতে এসব আধভাঙা কাচের জিনিস ভালো নয়। ব্যবহার করারও কোনো ইচ্ছে ছিল না। আমাকে হাত তুলতে হলো কারণ যে কম্পিউটার গেম খেলছিল তার হাতে রিভলভার। আরও দুজন এসেছে। দাঁড়ানো দেখে বুঝলাম ওরা মার্শাল আর্টস জানে। ভালোই জানে বলেই মনে হলো। তা না হলে এখানে কাজ পেত না। ওরাই আমাকে ধরে ঠেলে সামনের দিকে নিয়ে গেল। সেও একটা লোহার বল্টু লাগানো দরজা। এবার ঠেলতে ঠেলতে সামনে একটা কাচের ঘর। একজন চীনে ভদ্রলোক বসে। মোটাসোটা। একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছিলাম যে লিলিয়ানকেও ওরা টেনে আনছে। ওরা ভদ্রলোককে কী সব বলল—চীনে ভাষা তো বটেই তবে কিছু লোকাল চোরাটান আছে। ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন। এবার আমি স্পষ্ট ইংরেজিতে বললাম,

— তুমি কার্টেলের লোক। কুয়ালালামপুরে আজিজ আছে। তোমার নাম না জানার কথা নয়। আমি তার সঙ্গে স্যাটেলাইট ফোনে একটু কথা বলব।

— আমি বুঝতে পারছি না।

— বোঝাবার জন্যই বাইরে ফালতু ঝামেলাটা করতে হলো। তা না হলে তোমার কাছে পৌঁছোনো যেত না। লিলিয়ান, এবার তুমি কথা বলতে পারো।

— আজিজ মানে?

— মানে আজিজ। আজিজই। ও যদি জানতে পারে যে আমি কার্টেলের দপ্তরে এসে ওর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছি এবং আমাকে দেওয়া হয়নি তাহলে বেকার ঝামেলা বাড়বে।

— কিন্তু তুমি কে?

— জানতে পারবে। আজিজই বলে দেবে। সে এটাও বলে দেবে যে তোমাকে কী করতে হবে।

— আমায়?

— হ্যাঁ, তোমায় এবং তোমাদের এই বা অন্য লোকদের পক্ষেই এটা সম্ভব। দরকারে তুমি অন্য কারও সঙ্গে কথা বলে নিতে পারো।

— তুমি কে? কার্টেলের চেনা?

— চেনা কিন্তু কাছের লোক সম্ভবত নয়। এ নিয়ে কথা থাক। আমার আগে আজিজকে দরকার।

— আমি দেখছি কিন্তু আজিজ তোমার কে?

— ছাত্র বা শিষ্য, কিছু একটা বলতে পারো। ও বেইরুটে ছিল জানো?

— শুনেছি।

— আমার কাছেই ছিল। অনেক কিছু ও আমার কাছে শিখেছে। কখনো কিছু চাইনি। আজ আমি ওর কাছে কিছু চাই।

চীনা ভদ্রলোক ড্রয়ার টেনে হুইস্কির বোতল বের করে দুটো গ্লাসে ঢাললেন।

— আপনারা রিল্যাক্স করুন। আমি আসছি।

আমি লিলিয়ানকে বললাম,

— তুমি তো হুইস্কি খাও না। তোমার হয়ে ওটাও আমি খেয়ে নেব। আমি সেভেন্টি পারসেন্ট সাকসেসফুল। এটুকু ঠিকঠাক হলে, আই হোপ বেঠিক কিছু হয়নি, বাকিটাও হয়ে যাবে।

— এরা কী করবে?

— কী করবে না সেটা বরং জানতে চাইলে ভালো করতে। কার্টেল হলো ড্রাগ এম্পায়ারের একটি ভাইটাল কম্পোনেন্ট। এরা পারে না এমন কাজ বেশি নেই। আজিজ আমার কথা ফেলবে না।

চীনে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে আজিজের কথা কিন্তু বলাননি। আজিজ ঠিক কী কারণে আমি জাকার্তায় সেটা না জানলেও ওর কাছে খবর ছিল যে আমি এসেছি। আমার সঙ্গে অন্য কেউ কথা বলে। খুবই ভদ্র কণ্ঠস্বর। সেই রিসিভারটি একবার চীনে ভদ্রলোককে দিতে বলে। এবং তারপর আমাকে বলে যে

প্রয়োজনীয় ব্রিফিং আমিই যেন করে দিই।

সব শুনে চীনে ভদ্রলোক বললেন,

— এটা খুব বড়ো গ্যাংয়ের কাজ নয়। ছোটোখাটো জবওয়ার্ক। আপনি কাল চলে যাচ্ছেন?

— হ্যাঁ, বিকেলের ফ্লাইটে।

— খবর পেয়ে যাবেন। ম্যাডাম?

— আমি ডেভিডকে যদি পাই তাহলে একসঙ্গে ফিরব।

— পাবেন না কেন? এগুলো ভয় দেখাবার ব্যাপার। ডেভিড ব্ল্যাক ব্রিটিশ সিটিজেন। ভাববেন না।

ভাবতে হয়ওনি। পরদিন বেলা একটা নাগাদ ডেভিড ব্ল্যাক হাতে পায়ে দড়ি বসা ছড়ে যাওয়ার দাগ নিয়ে একটা ট্যাক্সি থেকে ব্রিটিশ এম্বাসির সামনে নামে। ওকে ওরা খুব ভালো খেতে দিত। সম্ভবত তার সঙ্গে ঘুমের ওষুধও থাকত। আমার চলে যাওয়ার পরের দিন ডেভিড আর লিলিয়ান রওনা হয়ে যায়। 'ইউ. এস.' কোম্পানি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। আমি লিলিয়ানকে বলেছিলাম আমাকে যেন ফোন না করে। পরে আমি ওকে ফোন করব। ইংল্যান্ডে। আমাকে কার্টেল সব খবর নিজেদের নেটওয়ার্ক মারফত জানিয়ে দিয়েছিল।

আজিজের সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি। কখনো হয়তো হবে না। না হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। কারণ আমাদের প্রস্থানের ব্যাপারটা সবসময় নাটকের নিয়ম মেনে হয় না। সেক্ষেত্রে কিছু করার নেই। সব ঘটনাই পেছনে দিকে হাঁটছে। রিওয়াইন্ড করার সময় ভিডিও টেপের মতো। অসহ্য শহর জাকার্তায় যা ঘটেছিল তাও এখন অতীত। ডেভিড ব্ল্যাক সেকেন্ড ডিভিশনের একটা টিমে কোচিং করাচ্ছে। লিলিয়ান তার ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে ব্যস্ত। জাকার্তায় আমাদের কোম্পানির কাজটা হয়নি।

তবে সুহার্তোর সরকার উলটেছে। ক্ষমতায় এসেছে সোকার্নোর মেয়ে মেঘাবতী সুকর্ণপুত্রী।

নেকলেস

ক্রাইম খুব বেড়ে গেছে শহরে। অস্বস্তি হয়। কিন্তু এটাও জানি যে ক্রাইম আরও বাড়বে। সেদিনই হেমন্তর গ্যারেজে বসে টিভির খবরে দেখছিলাম যে পুলিশ ক্রিমিনালদের কাছ থেকে কাড়া কয়েকটা ওয়ান-শটার, কান্ট্রিমেড দেখাচ্ছে। ওগুলোকে প্রস্তরযুগের হাতিয়ারের দলেই ফেলা যায়। এইসব নিয়ে এখনও ক্রাইম হয় এটাই বাঁচোয়া। অন্তত এখন অব্দি। উইলিয়াম পমেরয় আমার দেখা এক দুর্দান্ত অ্যামেরিকান। অ্যামেরিকান আর্মির বিরুদ্ধে, হাক গেরিলাদের হয়ে, ফিলিপাইনস-এ লড়েছিলেন। কমিউনিস্ট। আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মস্কোতে। প্রসপেক্ত মিরা ধরে আমি, পমেরয় আর আস্তাফিয়েভ হাঁটছিলাম। পমেরয় আমাকে তাঁর 'গেরিলা ওয়ারফেয়ার অ্যান্ড মার্কসিজম' দিয়েছিলেন 'উইথ লাভ ফ্রম আ ডিফিটেড গেরিলা'। বইটা আমার স্ত্রী যেখানে থাকে সেখানে সযত্নে রাখা আছে। যাইহোক, পমেরয় ওই ওয়ান-শটার নিয়ে অনেক গল্প করেছিলেন। কথাটা উঠেইছিল আস্তাফিয়েভের ব্যাদড়া পাইপের বার বার নিভে যাওয়া নিয়ে। লোকটাকে কোনোদিনই আমার ভালো লাগত না। মেক্সিকো সিটিতে গাড়িতে রাখা বোমা ফেটে মারা যায়। তখনও সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল। পমেরয় যতদূর জানি এখনও অ্যামেরিকান কমিউনিস্ট পার্টিতে আছেন। কয়েকটা লেখাও চোখে পড়েছে।

প্রায়ান্ধকার, স্বল্পালোকিত, ইতস্তত ম্লান আলো, কুয়াশার মতো নোংরা লেগে থাকা কাচের পেছনে ধ্যাবড়া ম্যানেকুইন, ওভারকোট পরা বেঁটে লোকেদের এক একটি নির্দিষ্ট পয়েন্ট থেকে পিছু নেওয়া, আচমকা ঝকমকে 'বেরিওঝকা' বা ডলার শপ, তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কমিউনিস্ট নেতাদের কালো কাচ, কালো রঙের 'জিল' গাড়ি, মেট্রোতে স্পার্তাকের সমর্থকদের হল্লা, কেন জানি না, ফাঁকা বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড দিয়ে হাঁটার সময় মস্কোই আমাকে পেয়ে বসেছিল। আসলে মস্কো নয়, আমি সেই কালো চুল দোভাষী আর্মেনিয়ান মেয়েটির কথা ভাবছিলাম যে আমাকে ইয়েরেভান নিয়ে যাবে বলেছিল। যদিও

pathagar.net

যাওয়া শেষ অব্দি হয়নি। জরুরি তলব পেয়ে আমাকে বুখারেস্ট চলে যেতে হয়। হাজি তখন পুরো ফর্মে। অথচ কী বিচ্ছিরিভাবে তাকে শেষ খেলার শেষে মাঠ ছাড়তে হলো। আমাদের দশা হয় বুড়ো ফুটবলার বা বক্সারের মতো। খুবই মর্মান্তিক কিন্তু কিছু করার নেই। এন. এস. পি.-২ নাইটভিশন লাগানো এ. কে.-৪৭ টার্গেট মিস করতে জানে না। ৮০০ থেকে ১০০০ মিটার দূরে কে অন্ধকারে আমাকে নিশানা করছে জানব কি করে? তার কাজ সে করছে। ভালোভাবেই করছে। ভালোবেসে করছে। এতে আমার আপত্তি থাকারই বা কারণ কি হতে পারে? গোটা ব্যাপারটা এত মজার যে হা হা করে ফাঁকা রাস্তায় কাউকে না চমকে দিয়ে হেসে উঠতে হয়।

তারপরই এইটুকু আমি বলতে পারি যে আচমকা আমার ডানদিকে (আমি বাঁদিকের ভাঙা ফুটপাত দিয়ে হাঁটছিলাম) কালো টাটা সুমো ব্রেক কষে আচমকা দাঁড়াল। ভেতরে বেশ জোরে রিকি মার্টিনের ল্যাটিন বিটের গান। গাড়ির থেকে লাফ দিয়ে দুজন নামল। কালো নেটের মাথা ঢাকা মুখোশ পরা। দুজনের হাতেই রিভলভার। ওরা আমাকে হ্যাঁচকা টানে গাড়িতে ওঠাল। ড্রাইভার আর ড্রাইভারের পাশে যে সেও মুখোশ পরা। পেটের দুদিকে রিভলভারের খোঁচা। ড্যাশবোর্ডে গণেশ মূর্তিতে আলো জ্বলছে নিভছে। পেছনেও কেউ ছিল যে আমার চোখটা শক্ত করে বেঁধে দিল। ওরা কোনো কথা বলেনি। রিকি মার্টিনের দরাজ গলা, সিগারেট ও জিনের আলতো গন্ধ, টাটা সুমোর স্পিড নেওয়ার আওয়াজ।

এরা গাড়িটা ফাঁকা রাস্তাতেই বোধহয় রাউন্ড খাইয়ে নিল কারণ এরপর কোনদিকে গাড়িটা চলছে আর বোঝা যায় না। আমি ভেবে দেখলাম যে খুব একটা কিছু আমার করার নেই। আর কী হতে চলেছে সেটা আমার আন্দাজ করা হয়ে গিয়েছিল। গাড়িটা এখন বেশ কিছুক্ষণ চলবে। আমার পেছনে সেলফোন বাজল। সেটা অফ করে দেওয়া হলো। আমার ডানদিকের লোকটা কয়েকবার কাশল। গাড়িটা আরও কিছুক্ষণ চলবে। তারপর রাস্তা ছেড়ে কিছুটা ভেতরে ঢুকবে। আমাকে নামাবে। আমি বুঝতে পারব পায়ের তলায় মাটি। ওরা আমাকে ঠেলে দেবে। আমি এগিয়ে যাব। তারপর গুলি করবে। এরকম কেসে যে বডিগুলো পাওয়া যায় সেগুলো সচরাচর উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়া এবং বেশ মজার। আমি ঠিক করলাম যে পড়ার সময়ে চশমাটা অন্তত আমি বাঁচাবই। এটুকু চেষ্টা করার অধিকার আমার আছে এবং আমি তা প্রয়োগ

করবই। দ্বিতীয়ত, এরা সেরকম না করে আমাকে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে মাথাতেও গুলি করতে পারে। সেরকম হলে চশমাটার কী দশা হবে সেটা অবশ্য সঠিক বলা যায় না। যদিও আমি এটাও জানতাম যে আরও কিছু আমি করব এবং সেটা গাড়ি থেকে নামানোর মুহূর্তেই।

চোখটা বাঁধা। তাই একাধিক সশস্ত্র বিপক্ষের অধিকারে যে ফাঁকা জায়গাটা নেই সেটা আমাকে কাজে লাগাতে হবে। আন্দাজেই। সেখানেই ঘটবে 'ফা জিন' অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ শক্তির বিস্ফোরক প্রকাশ। কারাটে বা শাওলিন কুং-ফু হলো কড়া স্টাইল—এর গতি রৈখিক, পেশির টেনশন ও শক্তি অনেক খরচ হয়। বরাবরই সফ্‌ট স্টাইল মার্শাল আর্টস আমার পছন্দ। তারমধ্যেও যেটা সবচেয়ে জনপ্রিয় সেটা হলো তাইজিকুয়ান—ইন-ইয়াং মুঠি, আক্রমণাত্মক অঙ্গকে আঘাত হানা। ভালো লাগে না। আমার পছন্দের ঘরানা বগুয়াঝাং— এতে দুটি হাত আটটি ত্রিরেখ রূপ নেয় যার নামগুলো এসেছে মহান তাও গ্রন্থ 'ই চিং' থেকে। আটটি ধাঁচের আক্রমণাত্মক মুদ্রা—মেঘগর্জন, জলরাশি, হাওয়া, পাহাড়, স্বর্গ, পৃথিবী, আগুন ও মেঘ। তবে বাগুয়াঝাং একটি মুক্ত ঘরানা, প্রয়োজনমতো এর মধ্যে শিংগুইকিয়ান, ৎজুয়ান, মোরিহেরি উয়েশিবা প্রবর্তিত আইকিদো, শিয়াও জিউ তিয়ান বা নয় ক্ষুদ্র স্বর্গের মিশেল চলতে পারে। কখনো 'বেং' বা তীরধনুক, 'পাউ' বা কামানের গোলা, 'পি' বা কুঠার অথবা ৎজুয়ানি মুদ্রায় বাজপাখি, ধানখেকো চড়াই, বাঁদর, আগুনের পাখি, ড্রাগন বা ঈগল হয়ে যাওয়া। গোটাটাই একটা চক্রাকারে বহমান যুদ্ধ ও একইসঙ্গে সচল সক্রিয় ধ্যান। বিশ্রাম নেওয়ার এটাই সময়। সজাগ বিশ্রাম। দুপাশ থেকে যারা রিভলভার ঠেকিয়ে রেখেছিল তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় যে আমার নিঃশ্বাস নেওয়াটা পাল্টে যাচ্ছে, নিঃশ্বাসের সময় পেটটা ভেতর দিকে ঠেলছে। এটা তাও পদ্ধতি। এর উল্টোটা বৌদ্ধ। ও, বলতেই ভুলে যাচ্ছি যে ৭০০ বছরের পুরোনো একটি ঘরানা আছে, উ দাং শন। এটি অত্যন্ত গোপন এবং আমিও জানি না। এসব বিষয়ে যাঁর কাছে আমার হাতে খড়ি তাঁর ট্যাংরায় একটা ছোটোখাটো ট্যানারি ছিল। এখন তাঁর ছেলেরা চালায়।

গাড়িটা বাঁদিকে মোড় নেওয়ার আগে কেন, সব সময়েই আমি বাইরের শব্দগুলোকে ধরতে চেষ্টা করছিলাম। গাড়ির ভেতরের স্টিরিও সংগীতের মধ্যেই। টিভির একটি পরিচিত অ্যাডের বাজনা একঝলক কানে পাওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গাড়িটা বাঁদিকে মোড় নিয়ে একটু পাথরের রাস্তা মানে নুড়ির

ওপর দিয়ে চলে থেমে গেল। আমিও নিশ্চিন্ত হলাম যে জায়গাটা মাঠ নয়। কারণ কানে আশপাশ থেকে কথার টুকরো, গাড়ির হর্ন ও পাম্প চলার আওয়াজ আসছিল। নিশ্চিন্ত হলেও নিজেকে সতর্কতার সুরেই বেঁধে রেখেছিলাম। জুতোর ঠোক্করে আর ঠেলা দেওয়ার ভঙ্গিতে বোঝা গেল সামনে সিঁড়ি। ছটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানদিকে। পাপোষ মাড়িয়ে মেঝে। ফের দড়ির কার্পেট বা ওই জাতীয় কিছু চেয়ারের গদি। হেলান দিয়ে বসলাম। ওরা আমার চোখ খুলে দিল।

সামনে কাচের টেবিল। তার ওপরে এক বোতল শিভাস রিগাল, কয়েকটা গ্লাশ, বরফ রাখার পাত্র, আমার প্রিয় সিগারেট 'ক্যামেল'-এর প্যাকেট। আমার সামনে বসে কালো নেটের মুখোশটা খুলতে আমি হেসে একটা সিগারেট নিলাম।

— 'তুই ছাড়া এই ধরনের স্টুপিড ইয়ার্কি কেউ করে? ধর্, আমার যদি হার্টের প্রবলেম থাকত। শিট্!'

— 'সরি বস্। কেমন আছ বলো। একটু কি মুটিয়েছ? না, না ফিট। এখনও সলিড।'

— 'উফ্। টয়লেটটা কোথায় বল্।'

আজিজ হাসতে হাসতে উঠে আমাকে টয়লেটটা দেখায়। মুখটা ভালো করে ধুলাম। কানে, ঘাড়ে জল দিলাম। ভিজে আঙুল দিয়ে চুল আঁচড়ালাম। তারপর বেরিয়ে দেখি তিনটে জিনস্ পরা ছেলে দাঁড়িয়ে। আজিজ তাদের বলল—'মিট মাই গুরু! অবশ্য গুরু বলা মানায় না। হি অপারেটস, অন অ্যান অলটুগেদার ডিফারেন্ট লেভেল। আমরা এঁদের নিজেদের দলে ফেলি না। ফেলা উচিত নয়। গুরু লাইক আ প্রপার মাস্টার ওয়ানস্ সেভড মাই লাইফ ইন বেইরুট। আমি কখনো ভুলব না।'

ওরা আমার সঙ্গে হাত মেলাল। ছেলেগুলো ভালো। কিন্তু একটু কম সজাগ। বন্দুকের ওপরে ওভার ডিপেনডেন্স থেকে এটা হয়।

— 'তোমরা যাও। এনজয় ইয়োরসেলভ্স। আমি আর বস্ একটু গল্প করি।...ছেলেগুলো ভালো, তবে বুঝতেই পারছ। আলগা টাইম তো, টাকার লোভটা বড়ো বেশি।'

— 'আলগা টাইম। ভালো বলেছিস। আলগা এবং ভালগার। আর কিছু জানি না, তাই। কী করব? ভালোই তো চালাচ্ছিস!'

— 'টাকার টার্মে ভালো। তবে ওইটুকুই। ছোটোলোকই থেকে গেলাম।

বেটার অফার মানে নিদেনপক্ষে লো ফ্রিকুয়েন্সি কোনো কাজ হলেও চলে যাই। আছে?'

— 'ভালো লোক ধরেছিস। যে কেবল ঘুমিয়ে সময় কাটায়। বেকার। অফার আসে না তা নয়। খুব কম। সার্কিট ছোটো হয়ে গেছে। বয়সও তো হচ্ছে। বাই দা ওয়ে, তোর কাছে ইগরের কোনো খবর আছে?'

— 'কেন, বল তো? এস. ভি. আর.-তে ঢুকবে?'

— 'না'। ইগরের কাছে আমি বেশ কিছু টাকা পাই। তা, আমাদের টাকায় একটা লাউজি বিগ সাম।'

— 'কোনো খবর নেই। এস. ভি. আর.-র মধ্যে পুবোনো কে. জি. বি.-র একটা সেল নাকি রয়েছে। হলে সেখানেই থাকবে। ও তো হাড়ে হাড়ে স্তালিনিস্ত ছিল।'

— 'মন্দ বলিসনি। কে. জি. বি.-র অনেক লোক এখন আমার মতোই ঘুমিয়ে সময় কাটাচ্ছে। স্লিপার। জেগে উঠে ভাবছে ভালো কিছু দেখবে।'

— 'তোমাদের পরিভাষায় স্লিপার কথাটার মানেটা একটু অন্য নয় কি?'

— 'হ্যাঁ। নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। বছরের পর বছর। তারপর হঠাৎ রিমোট-কন্ট্রোলে অ্যাকটিভেটেড হয়। অসম্ভব বোরিং।'

— 'মাফিয়ার খিদমৎগিরি করার থেকে সেটাও বোধহয় ভালো।'

এবারে আমি কথাটা ঘুরোলাম।

— 'বিয়ে করেছিস?'

— 'হ্যাঁ।'

— 'গুড। কাজের কাজ করেছিস একটা। বাচ্চা হয়েছে?'

— 'হ্যাঁ। একটা মেয়ে।'

— 'গ্র্যান্ড। তাহলে তো ব্যাপারটা সেলিব্রেট করার জন্যেই আজ মাতাল হতে হবে।'

— 'হও। আরও তিনটে দিন কলকাতায় থাকার কথা। তবে তোমার সঙ্গে সময় কাটানো আর বোধহয় হবে না। এখান থেকে ব্যাঙ্কক হয়ে...'

আবার আমি না শোনার ভঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে বলি,—'চিপস্ বা বাদাম টাদাম নেই?'

— 'কেন থাকবে না । খাবার আছে। ওদের একটু গরম করতে বলি।'

আজিজ উঠে গেল। আমি ওর লাইটার দিয়ে আরেকটা ক্যামেল ধরলাম। হুইস্কিতে একটা বড়ো চুমুক দিলাম। আজিজ ফিরে এল।

pathagar.net

— 'কেমন লাগছে?'

— 'দারুণ। হ্যাপি কিডন্যাপিং। তোর লাইটারের সেফাটিটা অন করে রেখেছিলিস। আমি অফ করে দিয়েছি।'

— 'বস!'

— 'বুলগেরিয়ানদের স্মল আর্মস আমার খুব পছন্দ। এটা ওয়ান-শটার। একসময় আমার ফেবারিট রিভলভার ছিল টোকারেভ রাশিয়ান।'

ফাঁকা হাতে দেওয়াল ঘড়িটার দিকে এইম করলাম।

— 'বন্দুক জিনিসটাই রিডিকিউলাস। তবে খুব বাজে অ্যাডিকশন হয়ে যায়। না, বরং প্রেমে পড়ার মতো। স্লিক, ব্লু স্টিলের একটা ছিমছাম রিভলভার অনেকটা ব্যালেরিনার মতো। বিউটিফুল।'

— 'তুমি কিভাবে আমাকে কালাশনিকভের মেকানিজম বুঝিয়েছিলে মনে আছে?'

— 'তোর মনে আছে?'

— 'থাকবে না? রিকয়েল আর মাজল্ ক্লাইম্ব কেন খুবই কম সেটা প্রথমে বুঝতে না পারার জন্যে মারতে বাকি রেখেছিলে। কেউ ভোলে?'

ফেরার সময় আমি একটা ট্যাক্সি পেলাম। ড্রাইভার দশ টাকা বেশি চাইল। আমি ওকে এক্সট্রা কুড়ি টাকা দিলাম।

গলির মোড়ে যে ছোট্ট চীনে দোকান থেকে আমার খাবার আসে সেটার ঝাঁপ আধখোলা। বেঁটেখাটো চীনে বউ, যাকে আমি চিয়াং চিং বললেই খচে যায়, বেরিয়ে এল।

— 'রাত-বিরেতে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরবে আর বলবে খাবার লাগবে না।'

— 'সত্যিই আজ লাগবে না। শিভাস রিগাল'...গলা অবধি দেখালাম।

— 'নিজেও উচ্ছন্নে যাবে, অন্যদেরও কষ্ট দেবে।'

— 'দেবই তো। গুড লাইট। সুইট ড্রিমস্।'

আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। ভগবান না থাকলে এরকম হতো? শুধু একটা ব্যাপার মনের মধ্যে খচ খচ করে। আজিজ ঝামেলায় পড়ে যাবে না তো? কার্টেল বড়ো নিষ্ঠুর। হলিউডের ফিল্মে যেমন দেখায় তার চেয়েও বেশি নির্মম। ঘুমিয়ে পড়ার আগে দুটো হাতের মুঠো বার বার খুলছিল আর আগুন ও সাপের মুদ্রায় নিজেদের সাজাচ্ছিল। শেষে ঠিক করলাম যে ব্যাঙ্ককে সোমানাকে

বলে আজিজের সুরক্ষার ব্যবস্থা করব। ও-ই না হয় আজিজকে বলবে সবটা। চালাক ছেলে। বাকিটা নিজের ওপর।

যোধপুর পার্কে এক বিবাহিতা বান্ধবীর লকারে আমার একটা জিনিস থাকে। ওর কাছেই চিঠিটা এসেছিল। বেরিল-এর অশিক্ষিত হাতের লেখায় দুটো মাত্র লাইন। '...সময় খুব কম। কফিনের এক পাল্লার ডালাটা বন্ধ হতে চাইছে, একবার আসবে?' মাস সাতেক আগের ঘটনা। বন্ধুরা ডাকলে আমরা যাই। এরকমই হয়ে আসছে।

বেরিলের কুরলার সুন্দর রাবার-লাইনড্, স্টুডিও-কাম ফ্ল্যাটটার এ দশা আমি আশা করিনি। ছেলে 'মুঘল দরবার' বলে একটা ব্যান্ড বানিয়েছিল। একটা ক্যাসেটও বেরিয়েছিল। ফিউশন। মন্দ না। ছেলের জন্যেই ফ্ল্যাট রাবার-লাইনড করেছিল বেরিল। সাউন্ড-প্রুফ। ছেলেটা ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয়ে নিখোঁজ। সে খবরটা জানতাম। বাকিটা ওপর ওপর কানা ঘুষোয় শুনলেও ভালো জানতাম না। বড়ো, চারতলা 'শাম্মি' অ্যাপার্টমেন্ট। নীচে এক ফালি পার্ক। বাচ্চারা খেলা করছে। মায়েরা গল্প করছে। হাঁটছে দাদু, দিদার দল। খুবই স্বাভাবিক। সুন্দর। সহজ। যেমন হয়। কিন্তু বেরিলের ফ্ল্যাটটার ভেতরে একট ছোটো ভৌতিক টরন্যাডো ঢুকে সবকিছু তছনছ করে চলে গেছে। নোংরা সোফা-কাম-বেড-এ যে জ্যান্ত মমিটা আধ মেশা হয়ে শুয়ে আছে সে আর যেই হোক আমার হ্যান্ডসাম বন্ধু বেরিল নয়।

pathagar.net

— 'বেরিল!'

— 'সরি। সেজেগুজে থাকা উচিত ছিল। উপায় নেই। যে কোনো সময় কোমায় চলে যাব। গেলে বেঁচে যাই। এনাফ্ ইজ এনাফ্।'

বেরিল কাশতে থাকে। ঘরে পেচ্ছাপের গন্ধ। বাইরে ছেলেমেয়েরা খেলা করছে। তাদের হাসি সাউন্ড প্রুফ ফ্ল্যাটে না ঢুকলেও আধমরা ম্যাড়মেড়ে রোদ্দুর ঢোকে।

— 'ওই ড্রয়ারটা টানো। এক কার্টন লাকি স্ট্রাইক আছে। তোমার জন্যে। আমার আনট্রিটেড লাং ক্যানসার। আমাকে একটা সিগারেট দাও। কাশি হবে। তবু দাও।'

আমি দুটো সিগারেট জ্বেলে একটা ওকে দিলাম।

'হামফ্রে বোগার্ট মানে বোগি কি করত জানো?'

— 'কী?'

— 'বাড়িতে শেষ অব্দি বিশাল পার্টি দিত। নিজে একটা হুইল চেয়ারে বসে থাকত। দু-আঙুলে ধরা থাকত জ্বলন্ত সিগারেট। টানত না।'

— 'তুমি তো টানছ।'

— 'কী এসে যায়? বেরিল ইজ নট বোগি। তবে শিগগিরি দেখা হবে। সকলের সঙ্গে দেখা হবে। রাজকাপুর, জেমস জিন, নার্গিস—সবার সঙ্গে।'

— 'ওরা গ্রিট করবে, না তুমি?'

— 'আমি। গুলজার লাগিয়ে দেব। আচ্ছা, স্বর্গ বা নরক যাই বল, ওখানে ক্যান্ড বিয়ার পাওয়া যায়?'

— 'ভগবানের দুনিয়ায় গিয়ে মালের ধান্দা করবে? খচে লাল হয়ে যাবে।'

— 'দেখ, আমরা হলাম দা নেমলেস প্রিভিলেজড্। আমাদের খাতির ওখানেও থাকবে। তবে জানবে, আই হোল্ড নো গ্রাজ্, কিন্তু একটা লোককে পেলে আমি ছাড়ব না। রাদার দুটো লোককে।'

— 'কারা সেই ভাগ্যবান?'

— 'আয়ান ফ্লেমিং আর জাঁ ব্রস্। ০০৭ আর. ও. এস. এস. ১১৭...'

বেরিল কাশতে শুরু করে। কাশি থামে না। সিগারেটটা ফেলে দেয় মেঝেতে। আমি জুতো দিয়ে পিষে দিই।

— 'ওই শিশিটা দাওতো...'

— 'এটা তো পাতি কাফ সিরাপ।'

— 'হোক না। ওষুধ তো। ঘুমও পাড়ায়। এখন আমার অ্যাডিকশন বলতে পার। দা লাস্ট ওয়ান।... অনেক বাজে বকলাম। আমার একটা কাজ তোমাকে করে দিতে হবে।'

— 'কি?'

— 'তুমি পাসপোর্টকে চেন?'

— 'চিনি মানে, আমি ওকে চিনি। ও-ও আমাকে চেনে। কার্টেলের লোক আমাদের না চেনাই ভালো। ফালতু বদনাম!'

— 'পাসপোর্টকে তোমায় মার্ডার করতে হবে। করবে, কথা দাও!'

— 'হঠাৎ আমি ফর নো রিজন পাসপোর্টকে...'

— 'না। পাসপোর্ট আমার শেষ বস। হ্যাঁ, টাকার জন্যে কার্টেলে গিয়েছিলাম।

pathagar.net

ওর কাজও করেছিলাম। কোনো হিচ্ হয়নি। আর কিভাবে সে তার দাম দিয়েছিল জানো?'

— 'কি ভাবে?'

— 'আমার বউ মেরিকে খুন করে।'

— 'বেরিল!'

— 'হ্যাঁ। তুমি মেরিকে দেখেছ?'

— 'বিয়ের আগে। তুমিই দেখিয়েছিলে।'

— 'রাইট। ও তো কারেন মেয়ে। ক্রিশ্চিয়ান। বার্মার জেলে অনেকদিন ছিল। শি হ্যাড আ কনজেনিটালি উইক হার্ট। ছেলে নিখোঁজ হওয়ার পরে আরও ভেঙে পড়েছিল। ক্রনিক হার্ট ফেলিওর-এর রোগি। মেরি!'

— 'তারপর?'

— 'আমারও সদ্য নিডল্ বায়পসি হয়েছে। রিপোর্ট পাইনি। পাসপোর্ট আমাকে টোকিওতে যেতে বলে। ভালো অফার। চলে গেলাম।'

— 'দেন?'

— 'যেদিন আমার ফ্লাইট সেদিন ডিপারচারের কুড়ি মিনিট পরে মেরির কাছে ফোন আসে প্লেন মিড-এয়ারে এক্সপ্লোড করেছে। দিস মেসেজ কিলড্ হার। প্রক্সিমেট কজ অফ ডেথ হয় করোনারি থ্রম্বোসিস বা অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন।'

— 'কিন্তু কেন?'

— 'কার্টেলের নিয়মে আমি মরে গেলে মেরিকে আমার অ্যাসাইনমেন্টের কন্ট্র্যাক্ট মানির দশগুণ দিতে হতো। পাসপোর্ট সেটা বাঁচাল।'

— 'তোমাকে বলেছে সে?'

— 'না। এরপরে মুম্বাই পুলিশের তাড়ায় পাসপোর্ট কাঠমাণ্ডু হয়ে পালায়। অবভিয়াস্লি আই. এস. আই. হেলপ্ করেছিল। এদিকে আমি তো কিছুই জানতাম না। মেরি নেই। ছেলে নেই। যা টাকা পেয়েছিলাম তাতে ট্রিটমেন্ট মানে টাইম বায়িং হয়তো হতো কিন্তু খেতাম কী? তাই ঠিক করলাম এভাবেই মরব। মরছিলামও। হঠাৎ একদিন জয়সওয়াল এল। ডেড ড্রাঙ্ক।'

— 'সে আবার কে?'

'পাসপোর্টের লোক। আমার কাছে কনফেস করতে। ও-ই ফোনটা করেছিল। পরে শুনেছি লোকটা সুইসাইড করেছে। এসেল ওয়ার্ল্ড-এ ফ্লাইং হুইল থেকে লাফ দিয়ে। ও অবশ্য আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল। ওকে গুলি করতে।

সঙ্গে লোডেড রিভলভারও এনেছিল।'

— 'পাসপোর্ট এখন কোথায়?'

— 'সাউথ ইস্ট এশিয়াতে কোথাও রয়েছে। জানি না।'

— 'আর কোনো ক্লু। এনি ড্যামড্ বিট অফ আ ক্লু।'

— 'আজিজ বলে একটা মালয়েশিয়ান ছেলেকে পাসপোর্ট রেখেছে অ্যাজ বডিগার্ড। ছেলেটা ক্র্যাকশট্। এ খবরটা জয়সওয়াল দিয়েছিল।'

— 'ছেলেটাকে আমি চিনি।'

— 'বলো তুমি কিছু করবে? কত টাকা দিতে হতো মেরিকে? কার্টেলের তাতে কিছু এসে যেত? বলো কথা রাখবে।'

— 'কঠিন। তবে চেষ্টা করব।'

— 'আমি জানতাম তুমি আসবে। আর এখন জানি যে তুমি কিছু একটা করবেই।'

— 'আমি চলি বেরিল।'

— 'লাকি স্ট্রাইকের কার্টনটা নিয়েছ?'

— 'নিতে হবে?'

— 'নিলে আমার ভালো লাগবে।'

— 'যাই, বেরিল।'

pathagar.net

বেরিল জলভরা চোখে কোটর দিয়ে দেওয়ালে দেখে। আমিও দেখি। মেরির যিশু। দেওয়ালের গায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ক্রুশ। তার ওপরে বিদ্ধ যিশু। আওয়ার ফাদার, হুইচ আর ইন হেভেন, হ্যালোড বি দাই নেম...

আমার একটা গোটা দিন আর অন্ধকারের অনেকটা এইভাবে কাটল যে শেষে এই প্রশ্নগুলোর তলায় উত্তরগুলোও লেখা হয়ে গেল। তবে সবটাই মনে মনে।

(১) পাসপোর্ট কেন এসেছে? কতদিন থাকবে?

— কার্টেলের 'সার্ক' অংশের তৃতীয় সারির মাথাদের মিটিং চলছে। তিনদিন না হয়ে দুদিনও লাগতে পারে।

(২) কোথায় চলছে এই 'বিশেষ অধিবেশন'? জায়গাটা চেনা?

— 'মেহেন্দি' বার-কাম হোটেলে। জায়গাটা চেনা। সামনে মাঝারি মাপের রাস্তা। কিন্তু টয়লেটটা পেছনে, গলির ওপর। গলির দরজা দিয়েই জমাদার ঢোকে।

(৩) কবে তুমি পাসপোর্টকে নিয়ে যাবে?

— দ্বিতীয় দিন। তৃতীয় দিন যদি মিটিং ভেস্তে যায়।

(৪) আর কারা এসেছে?

— অপ্রয়োজনীয়।

(৫) কেউ তোমাকে দেখেছে?

— যতদূর জানি, না।

(৬) 'মেহিন্দি'তে পুলিশ অ্যাকশন হতে পারে?

— পারে। হলে এবারে আমার পক্ষে বেরিলের শেষ অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়।

(৭) পাসপোর্টের বডিগার্ডদের অর্থাৎ আজিজ ও তার লোকজন সম্বন্ধে তোমার দুশ্চিন্তা?

— আমার পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রয়োজনীয়।

(৮) পাসপোর্টের উচ্চতা ও ওজন?

— পাঁচ দুই হবে, ৬৭+কেজি।

(৯) বন্দুক রাখে?

— হ্যাঁ। গাড়ি থেকে নেমে ছোটো, মেয়াপাতি ভুঁড়ির সঙ্গে প্যান্টের কোমর খাপ খাওয়ায়। পেছনে থাবড়ায়। যেখানে থাবড়ায় সেখানে হিপ পকেট থাকে না।

pathagar.net

(১০) পাসপোর্টের রিফ্লেক্স কিরকম?

— অপ্রয়োজনীয়। অলৌকিক কোনো ক্ষমতা থাকলে কিছু বলার নেই।

(১১) তুমি সঙ্গে রিভলভার নেবে?

— নেব। কিন্তু ব্যবহার করব না।

(১২) গাড়ি? চালাবে কে?

— একটু পুরোনো মডেলের যে কোনো চালু গাড়ি। হেমন্ত।

(১৩) ধরো, তোমাকে যদি ওরা ধাওয়া করে?

— শুট-আউট হবে। প্রতিপক্ষের অ্যাডভান্টেজ বেশি থাকবে।

(১৪) যদি পুরো প্ল্যানটাই ধ্বসে পড়ে। যদি মরতে হয়?

— এই জাতীয় স্টুপিড প্রশ্নের জবাব আমাদের জানা নেই। চুকে যায়।

(১৫) তোমাকে যে সিগন্যাল দেবে সে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে?

— করতে পারে। তবে না করারই কথা। আমি ওর বাড়ির লোকদের চিনে এসেছি। ওকে সেটা বলেওছি। এও বলেছি যে ভবিষ্যতে কখনও আরও কিছু টাকা ওকে আমি দেব। আপাতত একটা সিগন্যালের জন্য পাঁচ হাজার। খুব খারাপ কি?

(১৬) সেই গতানুগতিক পদ্ধতিতেই?

— না।

(১৭) কেন নয়?

— আমার ইচ্ছে।

(১৮) জায়গা, জিনিসপত্র— সব রেডি?

— হ্যাঁ।

(১৯) পদ্ধতিটার নাম?

— গোড়াতেই তো বলছি। নেকলেস।

ছেলেটা 'মেহেন্দি'র গোটা দশেক ওয়েটারের একটি। নিজেও একটু রংবাজ টাইপের। ওসব জায়গায় ক্যাবলা ছেলেদের চাকরি হয় না। ঝুটঝামেলা লেগেই থাকে। মাতালদের মধ্যে মারপিট। ভাঙুরা নাবিকরা এলে যা অবধারিত। শেষ বড়ো ঝাড়পিটটা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ান আর জাপানি সেইলারদের মধ্যে। বছরখানেক আগে। যাইহোক, ছেলেটা সিগারেট কিনছিল। আমি গাড়ি থেকে নেমে একটা কাগজ পড়ে বললাম এই ডাক্তারের চেম্বারটা কোথায়?

— 'সোজা চলে যান নাকের ডগা ধরে। ডাঁয়া পড়বে।'

— 'এসো না ভাই, চোখে রাতে দেখতে কষ্ট হয়।'

— 'তো ড্রাইভার রাখেন না কেন?'

বলতে বলতেই ছেলেটা গাড়িতে উঠল।

— 'তোমার তো ভালোই হলো। বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলে।'

— 'আপনি আমার বাড়ি চেনেন নাকি? এত জোরে যাবেন না। ছেড়ে চলে যাবে।'

— 'তোমার মেয়ে লিটল সিস্টার্স কনভেন্টে পড়ে?'

— 'আপনার মতলবটা কী বলুন তো।'

— 'বলছি। গাড়িটা দাঁড় করাই। এই জিনিসটা চেন?'

pathagar.net

— 'মাইরি, চেম্বার ফেম্বার শো করছেন। বিশ্বাস করুন, আমি এসব কেসে নেই।' ক্লাচ্ করে শব্দ হয়। ছেলেটা ঘামছে।

— 'আমি যা বলছি শোনো। ভয়ের কিছু নেই। টাকাটা গুনতে পারবে?'

— 'আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না সার। মরে যাব, সার!'

— 'কে মারবে তোমায়? তুমি তো কথা শুনবে। ছোট্ট একটা কাজ করতে হবে তোমায়।'

ছেলেটার বুদ্ধি আছে। বুঝে গেল। টয়লেটের গলির দিকে দরজাটা খোলা রাখবে। ভেজিয়ে। পাসপোর্ট যখন টয়লেটে যাবে তখন ও পকেটের রাখা দেশলাই সাইজের প্লাস্টিকের বাক্সে লাগানো বোতামটা টিপবে। বেশ কিছুক্ষণ পরে আজিজরা যখন কাঁধের ধাক্কা দিয়ে টয়লেটের দরজাটা ঠেলে ঢুকবে, খোলা রিভলভার হাতে ছুটোছুটি করে কেউ এদিক, কেউ ওদিকের দরজা দিয়ে বেরোবে তখন যেন ও হুড়োহুড়ির মধ্যে বাক্সটা কোথাও ফেলে দেয়। তখন ওটা পেলেও কিছু আসবে যাবে না। দ্বিতীয়ত, মালিক ততক্ষণে থানায় ফোন করবে। ভুল বোঝাবুঝিতে বড়ো ঝামেলাও লেগে যেতে পারে। তবে এটাও ঠিক যে ওভাবে আজিজরা হয়তো নিজেদের সম্বন্ধে জানান দেওয়ার ঝুঁকিটা নেবে না।

আর কাজ বাকি ছিল হেমন্তর সঙ্গে।

— 'গাড়ি, নাম্বার প্লেট সব আমি সাইজ করে নেব। কিন্তু তুমি কী করবে?'

— 'একটা লোককে গান পয়েন্টে গাড়িতে ওঠাব। তারপর যে রাস্তাটা বলেছি সেটা দিয়ে চালাবি।'

— 'আর লোকটা?'

— 'লোকটাও আমাদের সঙ্গে থাকবে।'

— 'তারপর?'

— 'তারপর তোকে যে তে-রাস্তার মোড়টার কথা বলেছি, সেটা ছাড়িয়ে পাঁচশো মিটার মতো যাওয়ার পর দেখবি ডানদিকে একটা মাটির রাস্তা চলে গেছে। একটু এগোনোর পরে দেখবি বাঁদিকে ভাঙা গেট একটা ফ্যাক্টরির শেড।'

— 'হেডলাইট জ্বালব? মাটির রাস্তায়?'

— 'আকাশে মেঘ না থাকলে চাঁদের যথেষ্ট আলো থাকবে। আর মেঘলা থাকলেও আমি বুঝে নেব। তবে বৃষ্টি যদি পড়ে তাহলে জ্বালতে হবে। মনে হয়

pathagar.net

পুরো জ্যোৎস্নাটাই পাব।'

— 'লোকটাকে তুমি কী করবে?'

— 'মার্ডার'।

— 'আমাকে দেখতে হবে? পারব না।'

— 'না। দেখতে হবে না। তুই স্টিয়ারিঙেই থাকবি। আমি কাজ হলে ফিরে আসব। আর কিছু বলার আছে?'

— 'এই মার্ডারটা করার জন্যে তুমি কত পাবে?'

— 'এক টাকাও না। 'শূন্যকে এক দিয়ে ভাগ করলে কি হয় জানিস?'

— 'অত জানলে মিস্তিরি হতাম? বলো।'

— 'ইনফিনিটি। মানে যার শেষ নেই। অনন্ত। তত আনন্দ পাব।'

— 'একটা জান নিতে জানো; দিতে পারবে?'

— 'না। আর যা যা নিতে বলেছি মনে আছে?'

— 'সব রেডি থাকবে।'

— 'ওখান থেকে আমি কোথায় যাব?'

— 'হাওড়া স্টেশন।'

— 'গুড। কাল, যে টাইম দেওয়া আছে।'

ফটফটে চাঁদের আলো ছিল। খুবই দয়ালু আলো। ভ্যানিলা আইসক্রিমের মতোই নরম কিন্তু বেশ দেখা যায়। একটা লোহার পিলারের সঙ্গে বাঁধা ছিল পাসপোর্ট। মুখটাও বাঁধা। আশপাশে কয়েকটা টুকরো টিন, একটা মদের ফাঁকা বোতল পড়েছিল। সেগুলো লাথি মেরে সরিয়ে দিলাম।

— 'আমি আসছি। তোমাকে একটা নেকলেস দেব ভেবেছিলাম। পরিয়েই দেব। গাড়িতে রয়েছে। নিয়ে আসছি। ততক্ষণে তুমি বেরিল আর তার কারেন ক্রিশ্চিয়ান বউ মেরির গল্পটা নিজেকে বলতে থাকো।'

পাসপোর্ট গোঁ গোঁ করে কী বলতে চেষ্টা করে।

— 'হ্যাঁ। জানি। এখন তোমাকে ছেড়ে দিলে তুমি, মানে কার্টেল আমাকে রাজা করে দেবে। তবে, ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, আজিজ ছেলেটাকে আমি রিয়্যালি ভালোবাসি। ওর কোয়ালিটির ছেলে তোমার বডিগার্ড হয়ে জীবন কাটাবে? এইজন্যে ওকে আমি হাতে ধরে শিখিয়েছিলাম? দাঁড়াও। গল্পটা নিজেকে বলতে থাকো। আমি এই তোমাকে নিয়ে গলির দরজা দিয়ে বেরোবার পর প্রথম

pathagar.net

সিগারেটটা জ্বালছি। আসছি।'

গাড়ির পেছনে, ডিকিতে, রাখা ছিল। নিয়ে এলাম।

— 'এটা একটা টায়ার। ভালো নয়। ছেঁড়াখোঁড়া। এটা, হ্যাঁ, মদেরই বোতলই তবে হাই অকটেন পেট্রোল ভরা। এই দলাটা হলো মবিল মোছা ন্যাকড়া। আর এটা দেশলাই। বৃষ্টির কথা ভেবে একটা লাইটারও সঙ্গে নিয়েছিলাম। বেরিল, তুমি দেখছ তো? আমি কথা রাখছি।'

সিগারেটটা নিভিয়ে দূরে ছুঁড়ে দিলাম।

— 'হাই অকটেন পেট্রোল আর আগুন তো কাছাকাছিই হতে চাইবে। সেরকমই তো নিয়ম। তাই না? হ্যাঁ, টায়ারটা তোমার গলাতেই পরিয়ে দিচ্ছি। নেকলেস। এবার নীচে নৌকোর খোলের মতো জায়গায়টায় ঢালছি হাই অকটেন পেট্রোল। গন্ধটা সুন্দর। তাই না? বেরিল বা মেরির এ বিষয়ে কিছু বলার আছে?'

আমি আকাশের দিকে তাকাই।

— 'এবার পেট্রোলের মধ্যে ন্যাকড়াটা দিয়ে দিলাম। না দিলেও হতো। সলতের কাজ করবে। পরে রবারটা জ্বলে উঠবে। যতক্ষণ না নিঃশেষে পুড়ে যায় রবারটা জ্বলবে। গোটা টায়ারটা জ্বলবে। দাঁড়াও, সাবধানের মার নেই। আর একটু পেট্রোল ঢালি। হ্যাঁ, এই তো তোমার রিভলভার। এটা আর আমি সঙ্গে রেখে কী করব? নাকি রেখে দেব? আচ্ছা, সেটা না হয় পরে ঠিক করা যাবে। প্রবলেমটা হচ্ছে ওতে আমার ফিঙ্গার প্রিন্ট আছে। আছে যখন তখন থাক। নেকলেস পরে তোমায় কিন্তু সুইট দেখাচ্ছে।'

দেশলাইটা বের করলাম।

— 'নেকলেস কিন্তু আমার ডিসকভারি নয়। সাউথ আফ্রিকার পুলিশ এ. এন. সি. গেরিলাদের জন্যে এটা প্রথম ব্যবহার করে। পরে অন্যান্যরাও করেছে। আমার ফালতু ক্রেডিট নেওয়ার কোনো অধিকারই নেই। এইবার আমি আগুনটা লাগাব। খুব আলতো করে। প্রায় না লাগানোর মতো করে। নেকলেস... নেকলেস...নে...ক...লে...স...।

দপ্ করে আগুনটা জ্বলে উঠতে নেকলেসের আলোয় দেখলাম পাসপোর্টের মাথাটা ডানদিকে ঝুঁকে পড়েছে। নেকলেস জ্বলছে। ঝলমল করছে নেকলেস। কিন্তু...পাসপোর্ট কি আগেই শক-এ মরে গেল নাকি?

pathagar.net

টেররিস্ট

প্রায় দেড়হাজাব মাইল দূর থেকে, সেখানকার একটা বড়ো শহর থেকে আমি এই শহরটাতে এসেছি। আমাদের এক শহর থেকে আরেক শহরে যাবার একটা কারণ থাকে যেটা সত্যি নয়। সেই কাজটাও আমাদের করতে হয়। আমি এখানকার হাসপাতালগুলোতে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে আছে নানা মাল ও নানা ধরনের এক্স-রে মেশিনের ক্যাটালগ। যে হোটেলে আমি উঠেছি সেখানে রয়েছে ডায়রি যাতে রোজ কোন্ কোন্ হাসপাতাল বা ক্লিনিকে গেছি সে সম্বন্ধে নোট, যেতে কত খরচ হয়েছে তার হিসেব, কয়েকটা ম্যাগাজিন, ভিজিটিং কার্ড। হঠাৎ যদি ওরা তল্লাশি করে তাহলে সন্দেহজনক কিছুই পাবে না। আমার ব্রিককেসেও সন্দেহজনক কিছু নেই। একটা সেলফোন আছে। রোমিং ফেসিলিটি আছে। সেলফোনেও কিছু পাওয়া যাবে না। কারণ যে কাজের জন্যে আমি এসেছি তার সবটাই আছে আমার মনের পেছনে। মনের সামনের দিকটা নিস্তরঙ্গ, শান্ত, স্বচ্ছ অ্যাকোয়ারিয়ামের মতো—যেখানে না আছে কোনো মাছ, না আছে মুক্তোর মতো—উঠতে থাকা বাতাসের বুদবুদ। মন সম্বন্ধে এই ব্যবস্থাটা চালু করার জন্যে আমাকে 'থট স্টপেজ' শিখতে হয়েছে। কাল আমার সঙ্গে তার দেখা হবে যে সেলফোন দিয়ে একটা নম্বর ডায়াল করলে টাইমার দেওয়া বোমাটা ফাটবে। আজ বিকেলে বোমাটা আমি পাব। বোমাটা আমাকে আজকেই রেখে আসতে হবে।

২

দুবার ট্যাক্সি পালটে আমি এই শহরের সাবার্বন রেলওয়ের ধারে সেই জায়গাটায় এলাম যেখানে একটা বাতিল বাফার রয়েছে আর কিছুটা দূরেই লেভেল ক্রসিং যেটা এখন বন্ধ থাকার কথা। তাই ছিল। দুপাশে সাইকেল, মোটরবাইক, রিকশা ভ্যান, লরি। লোকটা যেমন পোশাক পরে থাকার কথা তাই পরেছিল।

— পরের ট্রেনটা কটায় জানেন?

আমি জানতাম ও এই কথাটাই বলবে।

— পরের ট্রেনটা দশ মিনিট পরে।

এইটাই আমার জবাব হওয়ার কথা ছিল। ও একটা সিগারেট ধরাল। মিলে গেল। সিগারেটটায় ফিল্টার ছিল না।

— আপনি সিগারেট খান?

— না।

— বার্বি ডলের দাম বেড়েছে জানেন?

— জানি।

এখানে 'বার্বি ডল' মানে কেউ নজর রাখছে না। শব্দটা যদি 'ডানহিলে'-র হতো তার মানে কেউ নজর রাখছে। যদি বলত 'মোমবাতির', তার মানে হতো আমাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে।

— বিকেল আর বেশিক্ষণ নেই।

এরপর ট্রেনলাইনটা পেরিয়ে আমরা হেঁটেছিলাম। রিকশা, মানে সাইকেল রিকশা নিয়েছিলাম। কিছুটা গিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম।

একটা বস্তি এলাকা। বাচ্চাদের চিৎকার। ধোঁয়া। রান্নার শব্দ। রবার-পোড়া গন্ধ। সেখানে একজন মহিলা আমাকে পলিপ্যাকে বাঁধা বাক্সটা দিয়েছিল। দেখলে মনে হতে পারে পুতুল বা চকলেটের বাক্স। তিন-চারতলা বাড়ি এতে উড়ে যাবে। যেখানে ফাটবে সেখান থেকে বাতাস ধাক্কা খেয়ে সরে যাবে। তারপর যখন ফিরে আসবে তখন আগুন জ্বলে উঠবে।

৩

ওফ্, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে আজ আমার দুটো এক্স-রে মেশিনের বুকিং হয়েছে। ফ্যাক্স করে জানিয়েও দিয়েছি। আমাদের মেশিনের বাজার দিনকে দিন বাড়ছে। এরকমই হওয়ার কথা। প্রাইভেট সেক্টরে হেলথ্ এখন একটা বিরাট ব্যবসা। এভাবে চলতে থাকলে ফিরে গিয়ে একটা স্পেশাল রিওয়ার্ড আমি আশা করতেই পারি। অবশ্যই পারি। তবে, ফিরতে পারলে। আমার মতো অনেকেই দূরের অচেনা শহরে যেয়ে আর ফিরে আসে না।

৪

বাড়িটার ফোটোগ্রাফ আমি দেখেছিলাম। মনে মনে কপিও করে নিয়েছিলাম। এটাই ছিল দরকারি।

সেই মন্ত্রীর ফোটোও দেখেছিলাম। সে যে মেয়েটার কাছে আসে তারও। এগুলো না দেখলেও কিছু এসে যেত না।

আমাকে যেমন বলা হয়েছিল ঠিক তেমনই ছিল। বাড়িটার পেছেনে একটা বাতিল গোডাউন আছে এবং মাঝখানে গলি বললে ভুল হবে, এক ফালি জায়গা।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। দরজাটা, মানে অনেক দিনের পুরোনো, জংধরা তালা মারা দরজাটা বেশ শক্তপোক্ত। খুলতে একটু সময় লেগেছিল। সেলফোনের টর্চের আলোয় দেখেছিলাম ঘরটা ফাঁকা। একদিকে কেবল অনেকগুলো মোটা মোটা ড্রেনেজের পাইপ। তারই একটার মধ্যে পলিপ্যাকে মোড়া বাক্সটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম যেটা দেখলে, আগেই বলেছি, পুতুল বা চকলেটের বলে মনে হতে পারে।

একটাই খটকা থেকে গেল। তালাটা আটকাতে পারিনি। যদিও দেখলে বোঝা যাবে না যে তালাটা খোলা। আরেকটা অস্বস্তির কারণ হলো ঘরটা যতটা ছোটো আমি ভেবেছিলাম তার চেয়ে বড়ো ছিল। বোমাটা আরও ছোটো জায়গায় ফাটলে ভালো হতো। অবশ্য এটা নিয়ে চিন্তার কারণ অত ছিল না। একটু আড়াআড়ি ভাবে হলেও মেয়েটার ফ্ল্যাট বলতে গেলে ওপরেই। মেয়েটা একটা বিদেশি এয়ারলাইন্সের অফিসে কাজ করে। মন্ত্রী ওর বাড়িতে আসে সাড়ে আটটায়। তার পর সাদা ফ্লুরোসেন্ট আলোটা নিভে যায়। নীল আলো জ্বলে। সেটা এতই সামান্য যে একটু নীলচে আভা, তাও খুব নজর করলে দেখা যায়।

৫

আগে থেকে যেরকম কথা ছিল সেরকম ছকে হুবহু মিলিয়ে আমাদের দেখা হয়ে গেল। চোয়াড়ে বললেই বোধহয় লোকটার চেহারাটা সবচেয়ে ভালো বর্ণনা করা যায়। আমাদের দেখা হয়েছিল একটা বারে। টয়লেটের দরজায় সামনেই যে টেবিলটা সেখানে ও বসেছিল। আমি টেবিলটাতে, উলটোদিকে বসার একটু পরে

ও বুপপকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করল। ব্র্যান্ডটা আমার জানা ছিল। বেয়ারা এল। আমি একটা বিয়ার বললাম। ও সিগারেট বের করে, ঠোঁটে ধরে বলল,

— আগুন আছে?

আমি জিপ্পো লাইটারটা এগিয়ে দিলাম।

— জিপ্পো! ফাইন। আমার একটা ছিল। হারিয়ে গেছে।

— এখন তো আকছার পাওয়া যায়।

— কিনিনি। জানি পাওয়া যায়। ওটা ছিল প্রেজেন্ট।

— ও।

বেয়ারা বিয়ার নিয়ে এল। চোয়াড়ে আমাকে একটা সিগারেট অফার করল। বিয়ারে চুমুক দিলাম। বিয়ারের গ্লাসের গায় ঠান্ডা বাষ্প জমে মেঘলা হচ্ছিল। সেখানে আঙুল দিয়ে আনমনে একটা ক্রস আঁকলাম। এর মানে হলো বোমাটা ঠিক জায়গায় রাখা হয়ে গেছে।

একটু পরে চোয়াড়ে উঠে গেল। আমি বিয়ারের গ্লাসটা নিয়ে খালি করলাম। বেয়ারা আবার গ্লাসটা ভরে দিল।

pathagar.net

৬

সব সময় থট স্টপেজের নিয়মটা মাথায় থাকে না। ঘুমোবার সময় তো একেবারেই না। স্বপ্ন কি থামানো যায়? সেই রাত্তিরেই, মানে বিস্ফোরণের আগের রাত্তিরেই দেখি ওই ঘরটায়, যেখানে বোমাটা রেখে এসেছি, সেখানে চোয়াড়ে বসে অনেকগুলো ফোটো মেঝেতে ফেলে দেখছে। মন্ত্রীর মুখ। মেয়েটার মুখ। এই মেয়েটা কিন্তু আমার চেনা। অসম্ভব চেনা। কেন সেই মুখটা এই ফোটোতে এল ওটা ভাবতে ভাবতে ঘেমে যাচ্ছি আমি। আমি দাঁড়িয়ে আছি। সামনেই। অথচ চোয়াড়ে আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। তবে কি আমি অদৃশ্য? কিন্তু আমার জামাকাপড়, জুতো, ঘড়ি, জিপ্পো লাইটার—এগুলোও কি দেখা যাচ্ছে না? চোয়াড়ে তো আমাদের দলেরই একজন। তাহলে আমি কেন ও আমাকে দেখতে পাচ্ছি কি পাচ্ছে না নিয়ে সাত-পাঁচ ভাবছি। আর এই মেয়েটার জায়গায় অন্য, আমার সারা শরীর দিয়ে চেনা মেয়েটারই বা ফোটো এল কোথা থেকে। চোয়াড়ে আমার দিকে চেয়ে একটু হাসল। কেন?

তবে কি সে আমাকে দেখতে পেয়েছে? চিনতে পেরেছে? মেয়েটার ফোটোটা মেঝে থেকে তুলতে গেলাম। উঠল না। ফোটোটা রয়েছে নোংরা কাচের তলায়। চোয়াড়ে একটা সেলফোন বের করল। বোতাম টিপছে। ডায়াল করছে। আমি পাইপগুলোর দিকে তাকালাম। ওখানেই বিস্ফোরণটা হবে। অথচ আমি বা চোয়াড়ে, কেউই সুইসাইড স্কোয়াডের লোক নই। আমার তো বিস্ফোরণের ধারেকাছে থাকারই কথা নয়। কেন এরকম হলো? আমাদের প্ল্যানটা ছিল একেবারেই অন্যরকমের। তাহলে কি প্ল্যানটা পরে পালটেছে! এবং সেটা চোয়াড়ে জানতে পেরেছে, আমাকে জানানো হয়নি! এখনই যদি বোমাটা ফাটে তাহলে কী হবে? চোয়াড়ে সেলফোনটা এবারে কানে লাগিয়ে, মুখে কথা না বললেও কিছু শুনছে। বিস্ফোরণটা হলো কিন্তু অনেক দূরে কোথাও। চোয়াড়ে সেলফোনে শব্দটা শুনেছে। আমিও শব্দটা পেয়েছি। আচমকা চোয়াড়ে, মেঝেতে পড়ে থাকা ফোটো, ডাঁই করে রাখা পাইপ সবটা, সবকিছু একটা এক্স-রে প্লেট হয়ে গেল।

আমি, হোটেলের ঘরে, ঘুম থেকে চমকে জেগে উঠেছিলাম। ঘেমে গেছি। বুক ঢিব্ ঢিব্ করছে। গেঞ্জিটা খুলে ফেললাম। রাত দুটো দশ। বিস্ফোরণটা ঘটবে আগামিকাল, রাত দশটা দশে। ঘড়ির অ্যাড-এ সে টাইমটা দেখান হয়। পাখাটা বাড়ালাম। জল খেলাম। মিরর টেবিলের আলোটা জ্বাললাম। এক্স-রে মেশিনের ক্যাটালগ। কাল পৌনে দশটায় যে হোটেলটায় আমার সঙ্গে এই শহরের সবচেয়ে বড়ো নার্সিং হোমের পারচেজ অফিসারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেই হোটেলটার দোতলার বারান্দায় চমৎকার একটা বসার জায়গা আছে। সেখানেই বসব। জায়গাটা ওই পারচেজ অফিসারের ফেভারিট। ওখানে বসে কথাবার্তা বললে নাকি লাকি ডিল হয়।

এবারে ঘুমিয়ে পড়ার পরে আর কোনো স্বপ্ন আসেনি। প্রায় রিল্যাক্সড্ হয়ে গিয়েছিলাম একটা সিগারেট ধরানোর পর। চমৎকার ঘুম হয়েছিল।

৭

একটু টেনশন হয়েছিল। মোটা, দেখলেই মনে হয় সব সময় থতমত খেয়ে রয়েছে, সব সময় বিনবিন করে কপাল ঘামছে—লোকটা এল প্রায় দশটা বাজতে পাঁচে। জ্যামে আটকে পড়েছিল। নতুন ফ্লাইওভার তৈরি হচ্ছে বলে জ্যামটা

pathagar.net

বেড়েছে।

আমরা দোতলার বারান্দায় বসলাম। নীলচে আলো। সম্ভবত এরকমই একটা আলো ওই মেয়েটার ঘরেও এখন জ্বলছে। এবং সেটা চোয়াড়ে জানে। চোয়াড়ে এটাও জানে যে মন্ত্রী এসে গেছে। পারচেজ অফিসার বলল হুইস্কি খাবে। আমি নিলাম, সচরাচর যা নিয়ে থাকি—বিয়ার। দুপ্লেট ফিশ ফিঙ্গার বললাম। গাড়ির হর্ন, শহরের আওয়াজ, ভেতরে বাজনার শব্দ, আমাদের কথাবার্তা, পারচেজ অফিসার মাস্টার্ড-এ মাখিয়ে ফিশ ফিঙ্গার খায়, ঘাম ঝরে হুইস্কি খেলে,

— ফার্স্ট পেগটা আমি খুব কুইক, মেরে দিই। সেকেন্ডটাও। তারপর ধরে ধরে, স্লোলি...বাই দা ওয়ে আপনি কি বিয়ারই খান?

— হ্যাঁ।

— স্ট্রেঞ্জ!

ঘড়ির দিকে তাকাই। দশটা আট।

— আসলে আমার সিস্টেমে দেখেছি বিয়ার ছাড়া আর কিছু ঠিক সহ্য হয় না।

— ও, ঠিকই করেন। নিজের নিজের পয়জনে স্টিক্ করাই ভালো। কী বলুন!

দশটা নয়। এখান থেকে বিস্ফোরণের শব্দটা তো পাবই। ঝলকে ওঠা আলোটাও বোধহয় দেখা যাবে। আর প্লাস-মাইনাস সেকেন্ড দশেক। সিগারেট ধরালাম। অফার করেছিলাম।

— থ্যাংক্ ইউ, আমি স্মোক করি না।

৮

দশটা দশে কোনো বিস্ফোরণ হয়নি।

হওয়ার কোনো কারণই ঘটেনি। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে আমি এ শহর সে শহর ঘুরে এক্স-রে মেশিন বেচে বেড়াই। কিন্তু আমি টেররিস্ট নই। কোনো মন্ত্রী, বোমা, ডাঁইকরা পাইপ, নীল আলো জ্বালা মেয়ে, চোয়াড়ে, থট্ স্টপেজ—একটা কথাও সত্যি নয়। তবে এটা ঠিক যে স্বপ্নটা আমি দেখেছিলাম। হলিউডের

Pathagar.net

একটা ছবি স্টার মুভিজে দেখে মাথায় ঢুকে গিয়েছিল। ছবিটা দেখার পর থেকে যে শহরেই আমি যাই টেররিস্ট অ্যাকশনের একটা ছকও পাশাপাশি তৈরি করতে থাকি। এক্স-রে মেশিন গছাবার কাজটার একঘেয়ে রুটিনটাকে এইভাবে আমি কোণঠাসা করি। যেটা আমার রুটিরুজি সেটাকেই এখন আমার সাইড বিজনেস বলে মনে হয়। হলিউডকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার জানা নেই। ৯/১১-র পর থেকে ওরা আমাকে টেররিস্ট প্লটের রসদ সাপ্লাই করে চলেছে।

পারচেজ অফিসার তিনটে মেশিনের অর্ডার দিয়েছে। মোট পাঁচটা। আমাদের লাইনে এটা ফ্যালনা ব্যাপার নয়। মোটা আরও বলেছে যে ওরা মাঝারি শহরগুলোতে আরও ব্রাঞ্চ খুলবে। আরও ঘ্যাঁৎঘোঁৎ বাতলেছে। সব মিলিয়ে আমাকে হয়তো এই শহরটাতে কয়েক মাস পরেই আবার আসতে হবে।

তখন নতুন টেররিস্ট ছকেরও দরকার পড়বে।

pathagar.net

পৃথিবীর শেষ কমিউনিস্ট

২০২০ সালে ঘটনাটা ঘটবে। এই গল্পটার থেকেই প্রমাণিত হয় যে আজ থেকে সতেরো বছর পরে কি ঘটবে সেটা লিখে ফেলা সম্ভব। ১৯৯১ সালে যে সাভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তি ঘটবে সেটা দুনিয়ার সবচেয়ে নামজাদা ক্রেমলিনোলজিস্টারাও বলতে পারেনি। পৃথিবীকে বেশ কয়েকশো বার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করে দেওয়া যায় এরকম কয়েক হাজার নিউক্লিয়ার মিসাইল তাদের সাইলোতে ঘুমিয়ে থাকল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে টেক্কা দেবার মতো বিশাল সামরিক বাহিনী, পুলিশ, কেজিবি, লক্ষ লক্ষ পার্টি সদস্য সব হয়ে গেল ঠুঁটো জগন্নাথ। ঘটনাটিকে আমরা বিশ্বের বৃহত্তম প্যারালিসিস বলে অভিহিত করতে পারি। ভলকোগনভের মতো ঐতিহাসিকরা পরে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু এই মহাপতনের ব্যাপারটা একমাত্র আঁচ করা যায় সাহিত্যে— বুলগাকভ, গ্রসম্যান, লেভ আনাতোল থেকে সলঝেনিৎসিন হয়ে অনেকের লেখায়। হয়তো সরাসরি বলা হয়নি, কিন্তু ছিল— একটা সম্ভাবনা, একটা ধরতাই বা তার আদল। সাহিত্যই পারে। ২০২০— এই সংখ্যাটা পালটাতে পারে। কিন্তু গল্পটা ঘটবেই।

২০২০ সালে হোয়াইট হাউসের লনে, একটি সাংবাদিক সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আর্নল্ড-শোয়ারজেনেগার চলমান মার্কিন শতকের অমোঘ জয়যাত্রা সম্বন্ধে বলতে চেয়ে সংবাদটি জুড়ে দেবেন।

—...আর হ্যাঁ, আমি আপনাদের একটা খবর জানাচ্ছি— বিশ্বের শেষ কমিউনিস্ট কালকে মারা গেছে। অস্ট্রেলিয়ায়। বিরানব্বই বছর বয়স। সে ঈশ্বরে বিশ্বাস না করলেও ঈশ্বর তার আত্মাকে শান্তি দেবেন। পৃথিবীতে আর একজন কমিউনিস্টও নেই। এন্ড্ অফ দা রেড্...

রয়টার— কিন্তু মি. প্রেসিডেন্ট, আপনি খবরটা পেলেন কিভাবে?

— কেন? যেসব সোর্স থেকে আমরা নির্ভুল খবর পাই। সি আই এ, এফ বি আই, বন্ধু ব্রিটেনের এম আই-ফাইভ। আজকের পৃথিবী স্বচ্ছ। গোপন তথ্য বলে কিছু নেই। অন্তত হোয়াইট হাউসের কাছে।

pathagar.net

কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্টের যুক্তিকে নাকচ করে ক্রেমলিন ঘোষণা করবে যে প্রেসিডেন্ট শোয়ারজেনেগারের কথা ঠিক নয়। অস্ট্রেলিয়ান বৃদ্ধটি পৃথিবীর শেষ কমিউনিস্ট নয়। পৃথিবীর আসল শেষ কমিউনিস্টও মারা যাচ্ছেন। রস্তোভ-অন-দনের একটি হাসপাতালে। তাঁর নাম ভ্লাদিমির রুবাকভ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর' খেতাব পেয়েছিলেন।

সাংবাদিক ছেলেটির নাম রবার্ট ডয়েল। ফ্রিলান্স কাজ করে। 'দ্য ডেইলি রিপোর্টার' তাকে ই-মেলে মস্কোতে জানায়, যে তারা রুবকভের ওপরে একটা স্টোরি চায়। ই-মেলটা ডয়েল পেয়েছিল রাতে। পরদিন সকালেই ডয়েল এরোফ্লতের ডোমেস্টিক ফ্লাইট ধরে রস্তোভ-অন-দন-এ পৌঁছয়। রাশিয়াতে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের কোনো অভিজ্ঞতা তার ছিল না। যেরকম বেঢপ হোস্টেস সেরকম নোংরা টয়লেট। ত্রিশ বছরের ক্যাপিটালিজমও রাশিয়াকে সভ্যভব্য করে তুলতে পারেনি। রাশিয়ান ক্যাপিটালিস্টরা নাকি ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডও কিনতে চায়। ডয়েল রুবাকভের সন্ধানে বেরিয়ে আরও স্টোরি পেয়ে যায়। এরকমই হয়। ফ্যাকড়ার পর ফ্যাকড়া। স্রেফ ইন্টারেস্টিং করে তুলতে পারলেই হলো। ডয়েল রস্তোভ-অন-দনের মেট্রোপোল হোটেলে চেক-ইন্ করেই বেরিয়ে পড়েছিল। সঙ্গে নিত্যসঙ্গী ল্যাপটপ।

'রাশিয়াই বোধহয় বিশ্বে একমাত্র দেশ যেখানে হাসহাতালে আয়োডোফর্ম বা ওই জাতীয় প্রাচীন ডিসইনফেকটান্টের গন্ধ পাওয়া যায়'—এরকম একটা লাইন ভাবতে ভাবতেই ডয়েল বরিস ইয়েলৎসিন মেমোরিয়াল হসপিটালে ঢুকেছিল। রিসেপসনিস্ট মেয়েটি ভাঙা ইংরেজিতে বলেছিল,

— আপনি মি. ডয়েল?

— হ্যাঁ, প্রেস কার্ড দেখাব?

— দরকার নেই। ম্যাক্সিম ভ্লাদিমিরোভিচ রুবাকভ আধঘন্টা ধরে আপনার জন্যে অপেক্ষায়। উনিই আপনাকে পেশেন্টের কেবিন নিয়ে যাবেন।

ডয়েলের দিকে এগিয়ে এসেছিলেন ম্যাক্সিম। ডয়েলের জানা ছিল ম্যাক্সিম ইংরেজির অধ্যাপক। হাত মেলাবার পরে ডয়েল বলেছিল,

— কেমন আছেন আপনার বাবা?

— জ্ঞান আছে। অনর্গল কথা বলেছেন। কিন্তু আমাদের কথার জবাব দিচ্ছেন না। ডাক্তাররাও জানে খুব একটা কিছু করার নেই। আর তাছাড়া যুদ্ধে ওঁর দুটো কানই ভালো মতো জখম হয়েছিল। আপনি স্কটস্ল্যান্ডের, ভুল বললাম?

boiRboi.net

— না। একদম ঠিক।

— এখনও পড়ি, হিউ ম্যাক্‌ডায়ারমিড আমার প্রিয় কবি। পড়েছেন?

— নাম শুনেছি।

মান্ধাতার আমলের লিফট্-এর দরজা খুলতে খুলতে ম্যাক্সিম হেসে ফেলেন।

— খুব ইচ্ছে ছিল ম্যাকডায়ারমিডের ওপরে কাজ করব। স্কটস্ শিখেছিলাম সেইজন্যে। 'ফার্স্ট হিম টু লেনিন' পড়তে হলে বা 'আ ড্রাংক ম্যান লুকস্ অ্যাট দা থিসল'—স্কটস্ আপনাকে জানতেই হবে। সত্যি বলতে বার্নস-ও আমাকে অতটা টানেন না।

বারান্দায় মোটাসোটা এক মেট্রন রুশি ভাষায় ম্যাক্সিমকে কিছু বলেন। ম্যাক্সিম হাসেন।

— কথা বলেছেন একটানা...আপনি রুশি বোঝেন?

— খুব একটা না। টুরিস্ট হয়ে এলে অসুবিধে হবে না।

— ভাববেন না। আমি বলে দেব।

— আচ্ছা, এই যে বলা হচ্ছে আপনার বাবা পৃথিবীর শেষ কমিউনিস্ট! এটা আপনি বিশ্বাস করেন?

— কাগজে, টিভিতে তো তাই লিখছে। ক্রেমলিনও তাই বলছে।

— কিন্তু আপনি? আমি আপনার কথা বলছি।

তখন ওরা দুজনেই কেবিনে ঢুকছে। তাই ম্যাক্সিম আর জবাব দেওয়ার সময় পাননি। একজন ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন। মনিটারিং মেশিন। পর্দায় আঁকা বাঁকা জীবনের সচল ফুলকি। নার্স।

বৃদ্ধ রুবাকভকে একটু উঁচু করে শোয়ানো। বৃদ্ধ, খুবই বৃদ্ধ, কিন্তু শীর্ণ নয়, চওড়া কপাল, সাদা চুল খোঁচা খোঁচা, চোখ দুটো বন্ধ, হঠাৎ খুলে গেল, স্পষ্ট কথা বলেন বৃদ্ধ।

কাল থেকে বলছেন...স্তালিনগ্রাদ ফ্রন্টের কথা...বৃদ্ধ কাউকে ডাকেন,

— রুবিন! রুবিন!

ম্যাক্সিম বলে যান,

— রুবিন ছিলেন বাবার খুব বন্ধু। স্পেনের কমিউনিস্ট-নেত্রী দোলোরেস ইবারুরি-র ছেলে। ওঁরা স্পেনে একসঙ্গে লড়েছিলেন। রুবিন স্তালিনগ্রাদ যুদ্ধে মারা যান। বাবা পাশে ছিলেন তখন।

বৃদ্ধ বেশ জোর দিয়ে কিছু বলতে থাকেন যার মধ্যে রুবিনের নামটাও

pathagar.net

থাকে। ডয়েল বোঝে না।

— বাবা রুবিনকে বলেছেন যে, রুবিন, এত তাড়াহুড়ো করে মরলে চলবে না। জার্মান বোমারুরা, স্তুকা, আর আকাশে নেই। এখন আকাশ কেড়ে নিয়েছে আমাদের স্তরমোভিক বোমারু। জমি দখল করে নিয়েছে আমাদের টি-৩৪ ট্যাঙ্ক। আকাশে যত আলো সব আলো আমাদের কাতিয়ুশা রকেটের। রুবিন এখন তোমার মরে যাওয়া চলবে না। রুবিন, কমরেড স্তালিন আমাদের বলেছেন... রুবিন তোমার পায়ের ভ্যালেনকি...

ফুঁপোতে থাকেন বৃদ্ধ...

ম্যাক্সিম বলেন,

— ভ্যালেনকি হলো স্নো ফেল্ট বুট। লাল ফৌজ পরত। তার তলায় দুজোড়া উলের মোজা। জার্মানদের ভ্যালেনকি ছিল না। ওরা জমে গিয়েছিল। রুবিন যেদিন মারা যায় তাপমাত্রা ছিল মাইনাস চুয়াল্লিশ। উনি কাঁদছেন কারণ রুবিন মারা গেছে। কালকেও রুবিনের কথা বলেছিলেন।

ফুঁপোনোটা থিতিয়ে আসে। বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস পড়ে। আবার ঠোঁট কাঁপতে থাকে...জার্মান ভাষায় কথা বলেছেন, ডয়েল জার্মান জানে, কথাটার মানে হলো, 'এই জুকভ লোকটা আবার কে?' কথাটা বলতে বলতে বৃদ্ধ হাসতে থাকেন। অন্তত ডয়েলের তাই মনে হয়।

ম্যাক্সিম ব্যাখ্যা করে দেয়,

— লাল ফৌজের একটা জোক্। জার্মান জেনারেল ভন্ রুনস্টেড, ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারিতে তাজ্জব হয়ে গিয়ে কথাটা বলেছিল। আরও অবাক হয়ে গিয়েছিল জেনে যে, মার্শাল জুকভ গরিব কৃষক পরিবারের সন্তান। প্রুশিয়ান জুংকার-এর বিস্ময় কাটেনি। ওই কথাটাই লাল ফৌজের সৈন্যরা বলত। যুদ্ধের সময় এরকম অনেক জোক্ ছিল। কত গল্পই যে বাবার কাছে শুনেছি...

হঠাৎ নার্স কিছু একটা লক্ষ করে উঠে দাঁড়ায়। মনিটরের দিকে তাকায়। তারপর ফোন করে...বৃদ্ধের নিঃশ্বাস নেওয়াটা হঠাৎ যেন অনেক কষ্টের একটা ওজন সরিয়ে নিতে হচ্ছে, বাঁ হাতটা উঠে এসেছে...ডাক্তার হন্তদন্ত হয়ে আসে...

— রুবিন!

বৃদ্ধের চোখ দুটো খোলা। কিছু বা কাউকে খুঁজছিলেন। কাকে? কি? কোনো কমরেড? কোনো কমরেডের হাত। বা কোনো বুলেটে ঝাঁঝরা কমরেডের হাত থেকে পড়ে যাওয়া রাইফেল? ডয়েল হঠাৎ জানলা দিয়ে বাইরে

pathagar.net

ACC. No. 37112

তাকায়। বার্চ গাছগুলো কাঁপছে। এ সময় কি ঝড় ওঠে? বৃদ্ধের গলায় ঘড় ঘড় শব্দ। ডাক্তার নার্সকে কী একটা বলে। নার্স অ্যাম্পুল নেয়, সিরিঞ্জ ফোটায়। বৃদ্ধ কয়েকটা কথা বলে ওঠেন, বিড়বিড় করে বলা কয়েকটা কথায়। এর পরে আর কিছু নেই। ম্যাক্সিম তার পিতার মৃত্যুর পরে ডয়েলকে বলেছিল,

— বাবা শেষে যেটা বলছিলেন সেটা হলো ভন্ পলাসকে পাঠানো রকোসভস্কির শেষ সাবধানী বার্তা—আপনার সৈন্যদের অবস্থা শোচনীয়। তারা ক্ষুধা, অসুখ ও তীব্র শীতের শিকার। নিষ্ঠুর রুশি শীত সবে শুরু হয়েছে। তুষারবৃষ্টি, বীভৎস হাওয়া ও তুষার-ঝড় এখনও শুরু হয়নি। আপনার সৈন্যদের শীতের পোশাক নেই...স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে ১ লক্ষ ৬০ হাজার নাজি সৈন্য মারা যায়, বন্দী হয়েছিল ৯০ হাজার...

সেদিন অল্প হলেও তুষারঝড় একটা রস্তোভ-অন-দনের ওপর দিয়ে বয়ে যাবে। রিপোর্ট লন্ডনে পাঠিয়ে কিছুক্ষণ রুশি টিভিতে সার্কাস দেখবে ডয়েল। সাইবেরিয়ার বাঘের সার্কাসের এরিনায়। জ্বলন্ত সিং-এর ভেতর দিয়ে গলে যাচ্ছে। তারপর টিভি অফ করে ঘুমিয়ে পড়বে। সেই রাতেই অনেকের ঘুম ছুটে যাবে।

সেই রাতেই বাল্টিক নৌ-বহরের নাবিকরা বিদ্রোহ করবে। বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়বে মস্কো গ্যারিসনে। হাজার হাজার শ্রমিক রাতের বরফকে পায়ে পিষে লাল পতাকা নিয়ে বেরিয়ে আসবে। ক্রেমলিনের দেওয়ালে ধাক্কা খাবে ঝড়ের শ্লোগান। সেন্ট পিটার্সবার্গ আবার লেনিনগ্রাদ।

সেই রাতেই ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্টরা, আর বিনা বন্দুকে নয়, অভ্যুত্থান ঘটাবে। অস্ট্রেলিয়ায় একের এক বন্দরে ছড়িয়ে পড়বে ধর্মঘট। বলিভিয়ায় ফেটে পড়বে টিন শ্রমিকদের বিক্ষোভ—লেনিন ও চে-র ছবি নিয়ে লাতিন আমেরিকার প্রত্যেকটা রাজধানী অচল করে দেবে ছাত্র ও মধ্যবিত্ত মানুষ। শ্রমিক ধর্মঘটে অচল হয়ে যাবে ফ্রান্স, ইতালি, গ্রিস, স্পেন...খবর আসবে আফ্রিকা থেকে, আরব দুনিয়া...

সারা দুনিয়া জুড়ে কমিউনিস্টরা ফিরে আসবে। হ্যাঁ। আসবে। তবে তার জন্যে আগামী সতেরো বছর বা তারও বেশি সময়ের প্রত্যেকটা ঘণ্টা ও প্রত্যেকটা মিনিট কাজে লাগাতে হবে। সারা পৃথিবী জুড়ে কমিউনিস্টরা ফিরে আসবে। আসবেই। আর দশ নয়, দশ হাজার দিন ধরে দুনিয়া কাঁপবে।

সেই কথাটাই এই গল্পে জানিয়ে দেওয়া হলো।